# উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

'সন্ধ্যার'

সারস্বত আয়তনের

অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

উত্তরপাড়া।

কলিকাতা ;

৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, চেরি প্রেস লিমিটেড হইতে

আর, কে, রাণা দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

# প্রকাশকের নিবেদন

স্বদেশী যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিভায় মুগ্ধ না হইয়াছিলেন, এমন বাঙ্গালী বিরল। তাঁহার তীব্র, সরল, সরস লেখনী বাঙ্গালীর প্রাণে এক নবজীবনের সাড়া আনিয়া দিয়াছিল। তিনি আপনার কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালী এখনও সেই শক্তিমান পুরুষের সম্যক পরিচয় জানে না। উপাধ্যায় মহাশয়ের একখানিও জীবন চরিত যে এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই তাহা আমাদের জাতীয় ত্রুটি বলিয়াই মনে হয়।

এই পুস্তকখানি উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আয়তনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সিংহের লিখিত। উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; সুতরাং এই পুস্তকখানির কোন অংশই কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। ইহা পড়িবার পরই আমার ইহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয় এবং এ কার্য্যে আমায় বন্ধু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার আমায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারা অন্যান্য ভাবে এই কার্য্যে আমার সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রকাশক—

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# ম্খ

এই কর্ম্মবীর সন্ন্যাসীর জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে বৈচিত্র্যই ইঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ আজ তিনি একভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন পুনরায় কিছুকাল পরে আবার তাঁহার জীবনের গতি অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। আজ তিনি যাহাকে ধ্রুবসত্য জ্ঞানে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রাণপণে অগ্রসর হইতেছেন, কিছুদিন পরে আবার কি ভাব উদয় হইয়া সব ধীর, স্থির ; আবার কি এক নূতন আলোক-দৃষ্টে সেই নূতন পথেই অগ্রসর হইলেন। এইরূপ বৈচিত্র্য যেন ইঁহার কার্য্যাবলীর সহিত আজীবন জড়ি রহিয়াছে। এবং এই জন্যই মনে হইতেছে এই বিচিত্রতার হস্ত হইতে যখন তিনি নিজেও নিষ্কৃতি পান নাই সুতরাং তাঁহার জীবনীখানিও যে সহজে সাধারণে প্রকাশ পাইবে এরূপ আশাও দুরাশা মাত্র। কারণ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই জীবনীখানি একবার মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু নানাপ্রকার দৈববিড়ম্বনায় ইহা সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। এই দৈববিড়ম্বনা অতীব কৌতুকপ্রদ জটিল সমস্যার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। কালধর্ম্মে যাঁহার জীবনী আজ আমি বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপ হ তাঁহার জীবনের সহিত ও এই জীবনীখানিরও অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া আমি অপরূপ আনন্দ লাভ করিতেছি। মানুষটি যেমন কখনও লোক-লোচনের ভিতর আসিয়া তাহাদের সঙ্গে কাজ করিয়া উৎসাহের সঞ্চার করিয়া আবার কোথায় সরিয়া যাইতেন কেহ জানিতেও পারিত না। এইরূপ এই জীবনীখানিও মুদ্রিত হইয়া তার পর কোন অজ্ঞাত রহস্যে আবৃত হইয়া পাঠকবর্গকে তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই।—

পরিশেষে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশ করার ভার গ্রহণ করাতে আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ

জ্ঞাপন করিতেছি। বস্তুতঃ তাঁহার উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক কখনও প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ। ইহার সঙ্গে আমি আর একজনকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিলে তাঁহার ও আমার কিছুই আসিয়া যাইবে না তবুও আমার বন্ধু শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহে তাঁহার অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কারণ তিনি উপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র ও বালককাল হইতে প্রায় দিবারাত্র তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন। তাঁহার ও আমার সহিত উপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক মনের কথা চলিত যাহা অপরের সহিত হইত না। তিনি আমাদিগকে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার বালক কালের অনেক কথাই তিনি আমাদের নিকট বলিতেন। ১৪ বৎসর বয়সের সময় এই অদ্ভুত বালকের গৃহত্যাগ করিয়া নগরায় কোনও উদ্যানে যাইয়া কালী সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন সময়ে ঘুড়ির ফেটি ধরিয়া সমস্ত দিন রৌদ্রে থাকিয়া কিরূপে জ্বরে পড়িয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কত রঙ্গ রসিকতা করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সংস্করণের প্রতি দৈবও বোধ হয় অনুকূল তাই আজ পুনরায় ইহা সাধারণে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। তবে এই অদ্ভুত দৈব বিড়ম্বনার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংস্করণে বিশদভাবে বিবৃত করিব এইরূপ অভিলাষ থাকিল। মান্যবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। ইঁহাদের যথেষ্ট আনুকূল্যে ও সাহায্যে আমি এই মহাত্মার যৎকিঞ্চিৎ সংগৃহীত জীবনীখানি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। ইতি।

নিবেদক—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ।

# উৎসর্গ

যিনি নূতন জাতীয় জীবনের উৎসস্বরূপ, যাঁহার শক্তি এই মৃত জাতিতে ও দেশে প্রাণস্পন্দন আনিয়া দিয়াছে—এই পতিত ভারতে কর্ম্মের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে—বাঙ্গালিকে নূতন জাতিতে পরিণত করিয়া জগতে ধর্ম্ম-গুরুর আসনে বসিবার যোগ্য করিয়া দিয়াছে ; যিনি সকল সময় সকল অবস্থায় আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন, সেই দেশগুরু পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের চরণকমলে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার।

# সূচিপত্র।

বিষয় পৃষ্ঠা

## বাল্য, কৈশোর ও যৌবন।



## ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ।

## বিলাত যাত্রা ও বিলাত-প্রবাস।

বিষয় | পৃষ্ঠা



## কর্ম্মজীবন।

## পরিশিষ্ট।

# নিবেদন।

হে উপাধ্যায়প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আবার আমি তোমাদের নির্ব্বাণোন্মুখ শোকানল উদ্দীপিত করিতেছি। যাঁহার প্রসন্নবদন দর্শনে ও মধুর বচন শ্রবণে তোমরা আনন্দিত হইতে, আজ আমি তাঁহার পরিবর্ত্তে একখানি সামান্য গ্রন্থ হস্তে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার অসীম জলধি-তুল্য জীবনের কয়েকটি তরঙ্গমাত্র চিত্রিত করিয়াছি। যাঁহার একদিকে মানবীসাধারণ জীবন অপর দিকে স্বর্গাভিমুখী দেবপ্রকৃতি, যাঁহার দেবচরিত্র আলোচনা করিলে নিদ্রিত মনোবৃত্তি সকল জাগরিত হইয়া উঠে, সেই প্রিয়জনের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখাইতে পাছে অসমর্থ হই, সেই জন্য কুণ্ঠিত হইতেছি। কিন্তু কেন যে আমি এরূপ দুরূহ পবিত্র-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিয়াছি, জানি না। তবে উপাধ্যায়-চরিত জনসাধারণ কাহারও নিকট অজ্ঞাত না থাকে, এই আমার এক-মাত্র অভিলাষ।

এই চরিত্র অতীব অদ্ভুত। এই উদারচরিত বিচিত্রচরিত মহাপুরুষের সংকল্প, উদ্দেশ্য এবং কার্য্যকারিতা যথাযথ লিপিবদ্ধ করা অতীব সুকঠিন বুঝিয়াও যখন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তখন একমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। দয়াময় ভগবান আমাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়াছেন, তদনুসারে আমি আপন শক্তির পরিচয় দিলাম। যাহা কিছু অসম্পূর্ণ থাকিল, তাহা আমার পরবর্ত্তী যিনি যাহা পারিবেন, তাহা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া লইবেন।

উপাধ্যায়-চরিত একটি বিস্তৃত সংগ্রামক্ষেত্র-বিশেষ। সকল ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণনায় আমি অসমর্থ; তবে কোন বিশিষ্ট বিষয় পরিত্যক্ত

না হয়, সে জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর সম্ভব তাহা সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন আপনাদের নিকট ইহা আদৃত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইহাতে আত্ম-অভিমত বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি নাই। তাঁহারই অভিমত ও বিশেষভাব সকল সন্নিবেশিত হইল। সুতরাং ইহার সমালোচনার ভার পাঠকগণের হস্তে অর্পিত থাকিল।

আর একটি কথা, আজকালকার রাজনৈতিক হিসাবে অনেক কথা সিডিসানের অন্তর্গত হয় বলিয়া তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা এবং তাঁহার মুখের অনেক কথা পাঠকগণকে উপহার দিতে পারিলাম না। এ জন্য পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। জীবনের ধর্ম্ম-অংশটুকু বাদ দিলে আজকালকার আইন হিসাবে বাকীটা সবই সিডিসান!

---

# উপক্রমণিকা

আমরা হিন্দু। ঋষিগণ-প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি প্রতিপালন করা আমাদিগের একটি ধর্ম্ম। হিন্দুমাত্রই দ্বিবিধ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী। একটি লৌকিক বা সামাজিক ধর্ম্ম, অপরটি পারমার্থিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক ধর্ম্মসম্বন্ধে একজন অন্য হইতে পৃথক্ থাকিতে পারেন, আত্মতৃপ্তি অনুসারে আপন ঈপ্সিত পথ অবলম্বন করিতে পারেন, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেই তাঁহাকে সামাজিক বন্ধনে সকলের সহিত একমত হইয়া চলিতে হইবে—ইহা অপরিহার্য্য।

হিন্দুর হিন্দুত্ব কেবল মাত্র পান ভোজনের বিচারের উপর নির্ভর করে না। হিন্দুর হিন্দুত্ব কেবলমাত্র ধর্ম্মমতের বিচারের উপরেও নির্ভর করে না। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখাই হিন্দুর হিন্দুত্ব—এইটিই হিন্দুর বিশেষত্ব।

সামাজিক আচার ব্যবহার ও সৌজন্য আমাদিগের মধ্যে এমনই প্রবল যে, একজন অন্য এক অপরিচিতের সহিত আলাপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন—আপনি কি? অর্থাৎ আপনি কোন বর্ণের? আপনি নাস্তিক বা আস্তিক হউন আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, আমার জিজ্ঞাস্য আপনি হিন্দু কি না? সুতরাং ইহার দ্বারা বেশ প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা হিন্দু মাত্রেরই একটি প্রধান কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম।

সামাজিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যের দলভুক্ত বৈষ্ণব, বুদ্ধের

দলভুক্ত বৌদ্ধ, চার্ব্বাকের দলভুক্ত নাস্তিক বা মায়াবাদী কর্ম্মশূন্যের দলভুক্তই হও, তোমাকে বাধা দিবার কেহ নাই। কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া যখনই সমাজ-বিগর্হিত কোন কার্য্য করিতে প্রয়াস পাইবে, তখনই চতুর্দ্দিক হইতে শত শত প্রবল প্রতিরোধ দ্বারা সমাজ তোমাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করিবে, শক্তি রহিত করিয়া দিবে এবং শত লাঞ্ছনা দ্বারা হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।

হিন্দুর সামাজিক বন্ধন যদি এরূপ কঠোর শাসন দ্বারা পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে এই আবহমান-কালব্যাপী শত শত বাধাবিপত্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত; এমন কি এতদিনে ইহার চিহ্নমাত্রও ভারতে থাকিত কি না সন্দেহ। এতদিনে মুসলমানের কোষবিমুক্ত তরবারির ঝলিত ফলকে, বৌদ্ধের আ-চণ্ডাল প্রেমদায়ী, নির্ব্বিকার-হৃদয়-মঞ্চের তলে, বা আত্মনিষ্ঠপরায়ণ ম্লেচ্ছের মার্জ্জিত নবীন জ্ঞানালোকে ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ করিত!

এই সনাতন সমাজপদ্ধতি অজাতশ্মশ্রু তার্কিক জ্ঞানবৃদ্ধের দ্বারা বা নবীন সভ্যতাভিমানী পিতৃপরিচয়-প্রদান-বিদ্বেষী নব্য সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত হয় নাই। ইহা সত্যব্রত তপোনিষ্ঠ পরদুঃখ-পরায়ণ ঋষিগণের বহু যত্ন ও অধ্যাবসায় দ্বারা সংগঠিত ও হিন্দু-ধর্ম্মের শাসনে পরিচালিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

তুমি হিন্দু থাকিয়া বুদ্ধকে উপাসনা কর ক্ষতি নাই, তুমি কৃষ্ণকে উপাসনা কর ক্ষতি নাই, তুমি খৃষ্টকে উপাসনা কর, তাহাতেও ক্ষতি নাই যেহেতু সকল বর্ণ ও সকল ধর্ম্ম সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সকলের মূলাধার ও পরমগতি।

সাধনার ধর্ম্ম যাহার যাহাই হউক না কেন, সে সমাজধর্ম্মে অহিন্দু হইবে কিসের জন্য? সমাজপদ্ধতি মানিয়া চল, তোমাকে অহিন্দু বলিবার সাধ্য কাহারও থাকিবে না। নাস্তিকের দলও যখন হিন্দু

সমাজভুক্ত হইয়া সামাজিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তাহারা যখন সমাজ হইতে পতিত হয় নাই, তখন তুমি হিন্দু-সমাজ-পদ্ধতি মানিয়া থাক কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী এই অপরাধে সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে? ইহা কখনই ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হইতে পারে না। সমাজ-বিদ্বেষী বা সমাজ-বিরোধী না হইলে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত।

হিন্দুর সনাতন সমাজপদ্ধতি জগতের সম্মুখে আদর্শ শিক্ষার বিষয় এবং এরূপ কঠোর শাসনদ্বারা আবদ্ধ বলিয়াই এতদূর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে সমাজের সহিত এক হইয়া যাইতে হইবে। সমাজ-পদ্ধতির বেষ্টনের মধ্যে আপনার বাসনা ও কামনাকে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। তবেই সমাজ তোমাকে সাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ করিবে। সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, সমাজ পদ্ধতি উড়াইয়া দিয়া, মহা কর্ম্মবীররূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেও সমাজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, এবং তোমার পক্ষে শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিবার স্থানও সুদুর্ল্লভ হইয়া উঠিবে। সমাজকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, সমাজ-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে না পারিলে, শাসনপদ্ধতির সহিত আত্ম-আকাঙ্ক্ষার স্রোত মিশাইয়া দিতে না পারিলে হিন্দু সমাজে কখনও প্রতিষ্ঠালাভ হয় না।

হিন্দু খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও সমাজপদ্ধতি সম্পূর্ণ বজায় রাখিলে হিন্দুসমাজে কতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ শ্রীমদ্ স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনী আলোচনা করিলেই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যদিও তিনি খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এককালে ম্লেচ্ছের দেশে গমন করিয়া, ম্লেচ্ছের অন্নগ্রহণ ও ম্লেচ্ছের সহিত বসবাস করিয়াছিলেন,

কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিলে একজন পবিত্র হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কিছু বলা যাইত না। যদিও তিনি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি হিন্দুসমাজপদ্ধতির কখন বিরোধী হন নাই। অধিকন্তু আজীবন ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। করাচী হইতে প্রকাশিত 'সোফিয়া' নামক মাসিক পত্রিকায় 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' নামক মাসিক পত্রিকায়, 'বঙ্গদর্শন' নামক রবীন্দ্র বাবুর পরিচালিত মাসিক পত্রিকায়, এবং ইদানীং 'সন্ধ্যা' নামক তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দৈনিক পত্রিকায় তাঁহার অন্তরের ভাব যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেকে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান ছিলেন; কেহ বলেন, তিনি পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন বটে কিন্তু শেষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং একপস্থলে দুই পক্ষের তুল্যভাবে সম্ভ্রম বজায় রাখা অতীব দুরূহ। পূর্ব্বেই পাঠকের নিকট নিবেদন করিয়াছি যে, আত্মঅভিমত বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না। তবে সত্যের খাতিরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ক্রমে যতই তিনি হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসমাজ-তত্ত্বের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ততই খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এক একটী মত ও বিশ্বাস শুষ্কপত্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয় হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উপর তাঁহার ভক্তি যেন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। কারণ ইদানীং তিনি 'চার্চ্চে'--(খৃষ্টীয় ভজনালয়ে) যাইয়া উপাসনাদি করিতেও বিরত হইয়াছিলেন। জীবনের পরিবর্ত্তনের সহিত, সত্য ঘটনাগুলি আনুপূর্ব্বিক সন্নিবেশিত করিলাম, ইহার দ্বারা পাঠক তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে আপনিই একটি অভিমত গঠন করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের যেরূপ

ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী হইলে এরূপ ব্যবস্থাপত্র গ্রহণে স্বীকৃত হইতেন না। তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, অধিকবার ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও ধর্ম্মান্তরগ্রহণ জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সুতরাং ইহার দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্যবস্থাপত্র এরূপভাবে লিখিত হইয়াছিল। নতুবা কেবল ম্লেচ্ছান্নভোজন-জনিত দোষেরই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিতেন।

পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাখানি পরিদৃষ্ট হইবে।

উপাধ্যায় হিন্দুই থাকুন বা খৃষ্টানই থাকুন সে বিষয়ে লক্ষ্য করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই; তিনি যে পতিত মাতৃভূমির সেবার জন্য মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইটিই তাঁহার জীবনের একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল।

বহুদিনের দাসত্বে মানুষের মনুষ্যত্ব রহিত হইয়া যায়, মানসিক শক্তি ক্ষীণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, শৌর্য্য বীর্য্য একেবারে লোপ পাইয়া যায়, এই সকল অনুভব করিয়া তিনি এই পতিত পদদলিত জাতির মধ্যে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরতার সঞ্জীবন মন্ত্র ঘোষণা করিবার জন্য, শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক হৃদয়ে এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল যে, তিনি আপনাকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিতেন। এক সময় পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালে যখন এলাহাবাদের বিশপের—( খৃষ্টীয় পুরোহিত ) সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন বিশপ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—Are you a Roman Catholic? তাহাতে ইনি সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন—No, I am an Indian Catholic.

জাতীয় জীবনের আদর্শ—স্বরাজ, জনসাধারণের মধ্যে বিঘোষিত করিয়া, ও সেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে কিরূপ নির্ভীক-হৃদয়ে বিঘ্নকারী অত্যাচারীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হয়, তাহার পরিচয় তিনি আপনিই দিয়াছেন। তিনিই এই নবভাবের অগ্রদূত-রূপে ভারতে মাতৃমন্ত্রের প্রথম ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবাসীর হৃদয়ে অগ্নিময় বীজমন্ত্র উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারত-শ্মশানক্ষেত্রে মহাশক্তির উদ্বোধনের জন্য মায়ের সঞ্জীবন মন্ত্র বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাই দেশের রত্ন ত্যাগ করিয়া কাচ গ্রহণ করি-তেছে। দেশের শক্তি উপেক্ষা করিয়া ভারতবাসী আজ কাঙ্গালের মত পরের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি হস্তে দণ্ডায়মান! তিনি সত্য ও স্বাধীনতার উপাসক এবং জাতীয় সাতন্ত্র্যের প্রচারক। তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতবাসী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মই ভারতকে যুগযুগান্তর রক্ষা করিয়াছে। তাই তিনি ভারতবাসীকে আত্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে বারবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, ভারতবাসী আজ মুক্তির জন্য উদ্‌গ্রীব। তাই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া মায়ের মঙ্গলময়ী প্রতিমা হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিতে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন।

তিনি স্বদেশ প্রতিমার উপাসক এবং মাতৃমন্ত্রের সাধক ছিলেন। জননী জন্মভূমি তাঁহার নিকট স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া অহরহ প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, তাই মায়ের পূজার জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য, পার্থিব কামনা ও সুখসম্ভোগ দূর করিয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই ত্যাগ অতুলনীয়। ভারত ইতিহাসে চিরদিনের জন্য ইহা স্বর্ণাক্ষরে শোভিত থাকিবে।

তিনি একজন উচ্চস্তরের দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু অতীব দুঃখের

বিষয় যে, তিনি সমাজের মধ্যে রাজনীতি-বিশারদরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই একদিন অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন —ভগবান্ একি হ'ল, ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া এতদিন পরে সংসারের পাঁক ঘাঁটিতে বসিয়াছি!

বাস্তবিকই তিনি একজন ভগবৎভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু পতিত জন্মভূমির মায়া তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ-ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ভগবান তাঁহাকে একজন কর্ম্মী সন্ন্যাসীরূপে গঠন করিয়াছিলেন। তিনিও শেষে কর্ম্মই একমাত্র জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন।

একস্থলে তিনি আপন প্রাণের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন— "আমার ঘর নাই—পুত্রকলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদা-তীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া—সেই নিভৃত স্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম—কথাটি ভুলিয়া যাইতে কিন্তু যত ভুলিতে যাই, তত ঐ কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটি কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে—এখন নির্জ্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়—সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে। নির্জ্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু চারি জন ভবঘুরে লোক ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে। বিস্ময়ের কথা—এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীন গরীবেরাই কেন এই খেয়ালে মজিল! জানিনা ভগবানের কি উদ্দেশ্য।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ঐ মুক্তির সমাচার, প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয় পবন স্পর্শে যেমন শীতার্ত্ত তরুর প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—

প্রিয়জন-সমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দলহরী উথলিয়া উঠে-- রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। আমি নর্ম্মদার আশ্রম ছাড়িয়াছি বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে আর একটি আশ্রমের নূতন ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিতেছি—স্থানে স্থানে স্বরাজগড় নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সেই সকল গড়—যজ্ঞীয় হোমধূমে পূত হইবে—বিজয় সিংহনাদে ধ্বনিত হইবে—শস্যশ্যামলতায় পূর্ণশ্রী হইবে।"

"শুনেছি মুক্তির সংবাদ। আমার জপ তপ বাঁধন ছাঁদন সব ঘুচিয়া গিয়াছে--আকুল পাগলপারা উধাও হইয়া বেড়াইতেছি। আর গোলামগড়ে থাকিতে চাই না—ঐ স্বরাজ গড় গড়িতে—স্বরাজ তন্ত্রের প্রজা হইতে—আমার প্রাণ সদাই আনচান।"

তাঁহার মহচ্চরিত্রের বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয়ে এক পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যকারিতার দিকে লক্ষ্য করিলে নির্জীব হৃদয়েও বলসঞ্চার হইয়া থাকে। কি সরলতা, কি উদারতা, কি তেজস্বিতা, সকলই একাধারে স্থান পাইয়াছিল। এবং এই সকল উপাদানে তাঁহার মধ্যে এক তীব্র ব্যক্তিত্ব-শক্তি গঠিত হইয়াছিল; শত্রু মিত্র সকলেই উহা অনুভব করিয়াছে। লক্ষ্য বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাও অদ্ভুত। ভাববিশেষের দ্বারা একবার হৃদয় অধিকৃত হইলে সেই ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন। সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্যস্থল। অন্যায় ও অসত্য দেখিলে তিনি শত্রু মিত্র বিচার করিতেন না। অকপট চিত্তে তাহা ঘোষণা করিতেন, সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহা ক্ষত বিক্ষত করিতেন। এই অকপট সত্যবাদিতার ফলে তিনি সমাজের মধ্যে

অনেকের নিকট—বিশেষতঃ অন্যায়নিষ্ঠ ইংরাজের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মাতৃভূমির মঙ্গলসাধনে সত্যপথ অবলম্বন করিয়া যদি অন্যের সমক্ষে বৈরিভাবে দণ্ডায়মান হইতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, ভগবানের নিকট নির্দ্দোষ থাকিবেন।

সহৃদয়তা তাঁহার একটি বিশেষ গুণ। তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইলে তিনি কখন বিমুখ করিতেন না। অত্যন্ত অভাব সত্ত্বেও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। এবং এই জন্য কখন কখন তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতেও দেখা গিয়াছে।

তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। অবসর কালে পাঁচজনে মিলিত হইয়া নানারূপ গল্পগাছা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ নানাবিধ বৈষয়িক যুক্তিমীমাংসা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন।

অর্থের অভাব তাঁহাকে চিরকালই ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হৃদয়ের বল এতই অধিক ছিল যে, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া শূন্যহস্তে অতি মহৎ মহৎ কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন।

তিনি একজন স্থির, ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। এবং এই সকল গুণে তিনি সকল বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন।

তিনি একজন বহুভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, লাটিন ও ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল।

দর্শনশাস্ত্রে—বিশেষতঃ বেদান্ত দর্শনে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-বাইবেল গ্রন্থখানি তিনি যেরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, ভারতে অতি অল্পলোকই সেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে; এমন কি, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যদিও তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তবুও হিন্দুর লৌকিক আচার ব্যবহারের সংস্কার হইতে অব্যাহতি পান নাই। এক সময় তিনি আপন এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন—তুমি অস্পৃশ্য অখাদ্য (ম্লেচ্ছের প্রস্তুত রুটি) ভক্ষণ করিয়াছ; তোমাকে গোময় ভক্ষণে শুদ্ধ হইতে হইবে। শিষ্য বহু যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলেন, কিন্তু শেষে পরাস্ত হইলেন।

যদিও তিনি আজীবন পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুশীলন করিয়াছিলেন তবুও ইঁহার সংস্পর্শে কখন আত্মহারা হন নাই। তিনি বলিতেন—হিন্দুরা যদি হিন্দুত্ব ত্যাগ করে, এবং য়ুরোপীয় হয়, তাহা হইলে অচিরে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি হিন্দুত্বের উপর, জাতীয়তার উপর, একনিষ্ঠতার উপর, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া য়ুরোপীয় অনুশীলন গ্রহণ করে, তাহা হইলে ইহপরকালে মঙ্গল হইবে! নিজের ঘর ছাড়িও না, অপ্রতিষ্ঠ হইও না, এইটিই তাঁহার চিরদিনের উপদেশ। এখানেই তাঁহার মহত্ত্ব।

বাস্তবিকই য়ুরোপীয় চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে এতদূর অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালি যে, এতটা বাঙ্গালি থাকিতে পারে, ইহাই তাঁহার মধ্যে একটি নূতনত্ব। য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাঙ্গালি যে পুনরায় এতটা বাঙ্গালি হইতে পারে—ইহা স্বপ্নাতীত।

তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলিতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনরায় জাগিয়া না উঠিলে ভারতের মঙ্গল নাই। ব্রাহ্মণের স্বার্থপ্রযুক্ত একাধিপত্যের বিপক্ষ ছিলেন। তবে সামাজিক শাসন একমাত্র ব্রাহ্মণের হস্তাধীন থাকিবে, ইহাও স্বীকার করিতেন। তিনি আরও বলিতেন—ব্রাহ্মণ নির্লোভ, শুদ্ধাচারী ও ত্যাগী না হইলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। ব্রাহ্মণেরা দধীচি ও দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় যে দিন ত্যাগস্বীকার দেখাইতে পারিবেন, সেই দিন হইতে

আবার ভারত তাঁহাদের পদতলে বসিয়া মস্তকোত্তোলন করতঃ আপন মহিমা জগতে মহীয়সী করিয়া তুলিবে। ব্রাহ্মণ্যশক্তিই সকল শক্তির মূলাধার। ব্রাহ্মণ্যশক্তির দ্বারা ক্ষাত্রশক্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ—বৈদিক সংস্কারের দ্বারা লোক-সমাজকে প্রবৃত্তির কালকবল হইতে রক্ষা করেন।

তিনি আরও বলিতেন—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম্ম পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে চিরকালই পরিচালিত করিবে। আসুক দারিদ্র্য, আসুক উৎপীড়ন, আসুক বিলাসিতা ও নাস্তিকতা, আসুক ম্লেচ্ছধর্ম্ম ও ম্লেচ্ছ-ব্যবহার, হিন্দু চিরকালই ধীর ও স্থির। উপরিভাগে তরঙ্গভঙ্গ আলোড়ন ঘূর্ণীপাক, কিন্তু অন্তরে অন্তরে হিন্দুর জীবন-গঙ্গা ব্রাহ্মণের ছন্দোময় শঙ্খনিনাদ অনুসরণ করিয়া অদ্বৈত-সাগরোন্মুখে অবিশ্রান্ত প্রধাবিত হইতেছে।

এইটিই তাঁহার মহত্ত্ব যে, তিনি অপরাপর সংস্কারকের ন্যায়, কাল-ধর্ম্মে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণকে কটূক্তি দ্বারা পুনরায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি তাঁহাদিগের পূর্ব্বগরিমা ও পূর্ব্বসম্পদ্‌গুলি নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিয়া সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সিংহশিশুকে প্রতিবিম্বের সাহায্যে তাহার আত্মধর্ম্ম পুনরায় হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তাঁহার ন্যায় ত্যাগী ও সংযমী পুরুষ কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? তিনি যে কাহারও কিছুরও বশ ছিলেন না, ইহা অতি সত্য।

তাঁহার বৈরাগ্য সাধনের প্রণালীও অদ্ভুত। প্রথম প্রথম যখন মনোমধ্যে সন্ন্যাসাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া ধারণা হইতেছিল, হৃদয় হইতে একে একে সংসারের সুখসমৃদ্ধিলালসা সকল ত্যাগ হইতেছিল, সেই সময় একদিন রাত্রিযোগে ই, বি, এস, রেলে উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে-

ছিলেন। গাড়িতে নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিদ্রা আর আসে না। সঙ্গে আঠার কুড়ি টাকা মূল্যের একটি ঘড়ি ছিল। কেবল মনে হইতে লাগিল, নিদ্রিত হইলেই চোরে ঘড়িটি চুরি করিয়া লইবে। ঘড়িটি অনেক সাবধানে রাখিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও এক একবার ঐ চিন্তা আসিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত দিতে লাগিল। অবশেষে—যাক্, দূর হ'ক ছাই—বলিয়া ঘড়িটি বাহির করিয়া গাড়ির গবাক্ষ দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ঘড়িটি একটি জলাশয়ে গিয়া পড়িল। এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

এরূপভাবে বৈরাগ্যসাধন কয়জন করিয়া থাকেন? এরূপভাবে মনের উপর আধিপত্য করিতে কয়জন সমর্থ হন? এরূপভাবে ত্যাগ কয়জন শিক্ষা করিয়া থাকেন?

তিনি চিরকুমার, সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জীবনে কোন আড়ম্বর ছিল না। দশহস্ত পরিমিত বস্ত্রের ছয়হস্ত পরিধানে ও চারিহস্ত উত্তরীয়ভাবে ব্যবহৃত হইত। এইমাত্র সম্বল ছিল।

যখন যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হইত, পরদিনের জন্য কখন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিতেন না। যতক্ষণ কিছু হাতে থাকিত, পাঁচজনের খাওয়া দাওয়ায় ধুমধাম করিয়া উড়াইয়া দিতেন। নিজের আহারের দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। শাক পাত ডাল ভাত ইত্যাদি সোজাসুজি রকমের দ্বারা কোন রকমে উদরটি ভর্ত্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। স্বহস্তে রন্ধন অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একসন্ধ্যা হবিষ্যান্ন আহার করিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু কার্য্যগতিকে সকল সময় উহা ঘটিয়া উঠিত না।

তিনি আপনার জীবন উচ্চ-আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন এবং চিরদিন মহদনুষ্ঠানে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তিনি এই পতিত

জাতির বহু মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ভাগ্যে এমন নিষ্কাম মাতৃভক্ত কর্ম্মযোগীর আর অভ্যুত্থান হইবে কি না জানি না। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে আমরা যে অত্যন্ত অভাব ও ক্ষতি বোধ করিতেছি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মৃত্যুর অধীন সকলেই, তবে যাহাদের মৃত্যুতে সমাজ, জাতি বা দেশ একান্ত অভাব অনুভব করে, তাহাদের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ব্যথাজনক। জন্মিলেই মৃত্যু আছে, ইহা ধ্রুব সত্য। এ বিধি রদ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু যে মৃত্যুতে সমাজে কোলাহল পড়িয়া যায়, লোকে অভাব অনুভব করে, সে মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? এ নশ্বর ধরাধামে প্রতিমুহূর্ত্তে কত নরনারীর মৃত্যু হইতেছে, প্রতিদিন শ্মশানে ও কবর-প্রাঙ্গণে কত মৃতদেহের সদ্‌গতি হইতেছে, কিন্তু কে তাহার সমাচার লয়? কে কাহার অভাব অনুভব করে? কিন্তু যখনই কোন মহা-পুরুষের অন্তর্ধ্যান হইয়া থাকে, তখনই চারিদিকে রোদনের রোল ছুটিতে থাকে ও বিষাদের মলিনছায়া সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

তিনি অতি দুঃসময়ে স্বদেশবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাতৃভূমির সেবায় মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল বিধান করুন। আর এই প্রার্থনা, উপাধ্যায়ের ন্যায় মনস্বী, তেজস্বী ও স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষ ভারতের গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মঙ্গল-সাধনে জীবন অতিবাহিত করুন।

তাঁহার অপূর্ব্ব ঘটনাবলীসম্বলিত মহজ্জীবনের আলোচনা ও মহদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি অকপট ভক্তি ও সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রয়াসী।

উন্নতমনা স্বাধীন পাশ্চাত্য-জগৎবাসিগণও তাঁহার সঙ্কল্পে ও সাধনায় মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে একদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—

Pandit Upadhaya is added to the roll of the national heroes of many lands and takes his place among those of our own Emmet, Wolfe Tone, Lord Edward and many imperishable names in Ireland, Switzerland, France and other countries, and in future years when the sun of liberty shall have risen on India, the name of the humble Bengali editor who dared to lift his voice on behalf of his country, will stand first among the martyrs for its freedom. Though dead, his spirit will be ever present among his countrymen and give them inspiration to follow in his foot-steps.

ভাবার্থ—পণ্ডিত উপাধ্যায়, অন্যান্য দেশের বীরপুরুষগণের তালিকায় মধ্যে একজন বীরপুরুষরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, এবং আমাদের দেশের এমেট, উল্‌ফটোন, লর্ড এডওয়ার্ড এবং আয়র্লণ্ড, সুইটছার্লণ্ড, ফ্রান্স, ও অপরাপর দেশের বীরপুরুষ সকলের ন্যায় তাঁহারও নাম চিরজাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। ভবিষ্যতে ভারতগগনে যখন স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত হইবে, দেশের জন্য আপন কণ্ঠধ্বনি সমুত্থানে সাহসী এই বাঙ্গালী সম্পাদকের নাম আত্মোৎসর্গকারীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিবে। যদিও তিনি মৃত তথাপি তাঁহার পবিত্র আত্মা চিরদিন তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে উৎসাহ প্রদান করিবে।

---

# উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

## প্রথম খণ্ড।

### বাল্য, কৈশোর ও যৌবন।

#### জন্ম ও বংশ পরিচয়।

মহাত্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হুগলী জেলার অন্তর্গত খন্নিয়ান গ্রামে ১২৬৭ সালের ১লা ফাল্গুন এক পবিত্র হিন্দুপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি-বাসস্থান খানাকুল-কৃষ্ণনগর। প্রপিতামহ ৺মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরম ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পণ্ডিতরত্নী মেলের শ্রীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান। সেকালের কুলগৌরব ও কুলমর্য্যাদা এই বংশে যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। কুলীনগণ তখন বহুবিবাহ করিতেন। ইনিও সেই কৌলীন্যপ্রথানুযায়ী পঞ্চাশটি বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষ এই খন্নিয়ান হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী হোয়েড়া নামক গ্রামে এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বকৃতভঙ্গ হন। শুনা যায় যে, একটি মাত্র শুপারি গ্রহণ করিয়া ইনি এই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামহ ৺হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। অবশেষে ইনিই এই খন্নিয়ান গ্রামে বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইনি জব্বলপুরে ঠগি-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। সেখানেও বাটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহার তিন সন্তান; জ্যেষ্ঠ ৺দেবীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যম ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ ৺তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৺দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন সন্তান; জ্যেষ্ঠ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যম পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিই আমাদের উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

ভবানীচরণ শৈশবেই মাতৃহীন হন। এই ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর-প্রসবিনী জননী, বিধাতার লীলাচক্রে শিশুর এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহধাম ত্যাগ করেন। জননী পুত্র প্রসব করিয়া যতদিন জীবিত ছিলেন, একদিনের জন্যও আপন শিশুকে সুস্থ অবস্থায় দেখিতে পান নাই। জন্মিয়া অবধি শিশু খোস্ পাঁচড়া ইত্যাদি নানা রোগে আক্রান্ত। অনেক প্রকার চিকিৎসা হইল; কিছুতেই কিছু হইল না। কিন্তু বিধাতার কি মহিমা! মাতৃবিয়োগ হইবার পর হইতেই শিশু ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইতে লাগিল; এবং কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শিশু পিতামহীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে লাগিল। পিতামহী, মাতৃহীন শিশুকে বক্ষে রাখিয়া সযত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন।

শৈশবে পিতামহীর নিকট দিনরাত থাকিয়া উপাধ্যায় খাঁটি বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর অনেক কথাবার্ত্তা এবং সেকালের অনেক হেঁয়ালী ও গ্রাম্যছড়া শিখিয়াছিলেন। শৈশবে শিক্ষিত এই সকল গৃহস্থালীর কথাবার্ত্তা, হেঁয়ালী ও গ্রাম্যছড়া, পরে তাঁহার সন্ধ্যার মধ্যে অনেকস্থলে প্রকাশ পাইয়াছিল।

স্বভাবের শান্তিময় ক্রোড়ে, পিতামহীর যত্নে বালক দিন দিন শশি-কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জীবনের প্রথমাবস্থা হইতেই ইঁহার জীবনের গতি স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সঙ্গী বালক-দিগকে আপন ইচ্ছার অধীনে আনিয়া পরিচালিত করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তাহারাও ইঁহার অধীনে থাকিয়া, ইঁহার আদেশানুযায়ী কার্য করিতে ভালবাসিত। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা যৌবন হইতেই

ইঁহার মধ্যে প্রবলভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই বাল্য-জীবনেই কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

## পাঠ্যাবস্থা।

ক্রমে বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইল। পিতা বালককে গ্রামস্থ এক পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ, খোঁড়া-পীতাম্বর অনেক দিনের গুরু; ভারি তেজী। নাতিদীর্ঘ বেত্রদণ্ডহস্তে কালান্তক যমসদৃশ বিরাজ করেন। ছেলেদের মধ্যে একটু কিছু এদিক ওদিক দেখিলেই প্রহারের চোটে ভূত ভাগাইয়া দেন। ইনিও যে খুব শান্তশিষ্ট তাও নয়। সময় সময় একটু আধটু দুষ্টামি করিয়া বেশ উত্তম মধ্যম পারিতোষিক লইতে হয়। তবে পড়াশুনায় খুব ভাল, খুব মাথা, খুব চালাক। সেই জন্য গুরু ভারি ভালবাসেন। কিন্তু একটু কিছু দোষ পাইলে, শাসন-দণ্ডের দ্বারা পদমহত্ত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। যাহা হউক, এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর এই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত গুরুর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

পিতাঠাকুর এইবার বালককে চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানে পড়াশুনা বেশ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে পিতা কর্ম্মানুরোধে চুঁচুড়া হইতে হুগলীতে আসিলেন। পিতার সহিত পরিবারবর্গও হুগলীতে আসিলেন। বালককে হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পড়াশুনা বেশ চলিতে লাগিল। সেকালের বিখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যবিশারদ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এখানকার হেডমাষ্টার, আর প্রিন্সিপাল মহাত্মা রবার্ট থোরেস্। বালক দিন দিন আপন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাশক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। হেডমাষ্টার ও প্রিন্সিপাল উভয়েই বালকের প্রতি অতীব সন্তুষ্ট, যথেষ্ট স্নেহ করেন। পরীক্ষায় এইবার বালক সহপাঠীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিল। প্রিন্সিপাল

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার—মুরস্ পোয়েটিকাল ওয়ার্কস্ ও গ্রিম্‌স ফেয়ারী টেল্‌স্, বালককে প্রদান করিলেন।

এখানে কিছুদিন বাস করিবার পর পরিবারবর্গ কলিকাতায় আসিলেন। বালককে জেনারল এসেম্ব্লী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখন ডাক্তার জার্ডিন্ প্রিন্সিপাল; এখানেও বেশ পড়াশুনা হইতে লাগিল। প্রিন্সিপাল সাহেব বালকের পড়াশুনায়—বিশেষতঃ ইংরেজিভাষার উচ্চারণ-পারিপাট্যে—বিশেষ সন্তুষ্ট। অন্যান্য শিক্ষকেরাও ভালবাসেন। বালক এখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। একদিন ইংরেজি রিডিং পড়ার পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের সহিত সমকক্ষতায় সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইল। প্রতিবারই পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিয়া বালক ক্রমশঃ উপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পরিবারবর্গ পুনরায় হুগলীতে আসিলেন। পিতা এইবার বালককে হুগলী কালেজস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে যথাবিহিত উপনয়ন হইল। উপনয়নের এক বৎসর পরে মাছমাংস ত্যাগ করিলেন। মৎস্য মাংস সেই যে ত্যাগ করিয়াছিলেন, মধ্যে কার্য্যগতিতে একবার ভিন্ন আর কখন গ্রহণ করেন নাই।

এইবার কিছু দিন এখানে পড়িয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করিলেন। সংস্কৃত পড়ার উপর ভারি ঝোঁক। ভাটপাড়ায় যাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে লাগিলেন। ব্যায়াম—কুস্তী, জিমনাষ্টিক, লাঠি, ক্রিকেট ইত্যাদির উপর খুব নজর। সমবয়স্কদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। সুতরাং ইনিই সকলের নেতা হইলেন। ইহাদের লইয়া ক্রমশঃ বেশ একটি দল গঠিত হইল।

## ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া এইবার কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। পড়াশুনা

বেশ চলিতে লাগিল। এই সময় একটী ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সূত্রপাত হইল। কতকগুলি আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী চুঁচুড়ায় বাস করিত। ইহাদের কয়েকটি দুষ্টপ্রকৃতির বালক, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা কলসী লইয়া জল আনিতে বাহির হইলেই, ঢিল ছুঁড়িয়া কলসী ভাঙ্গিয়া দিত। একদিন বাঙ্গালী দলের কয়েকজন মিলিত হইয়া ভদ্রভাবে তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু ইহাতে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিল না। পরে আর একদিন বিশেষরূপে নিষেধ করিয়া দিল এবং শেষ বলিয়া দিল যে, ভবিষ্যতে পুনরায় ঐরূপ হইলে একটা গণ্ডগোল বাধিবে। আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী বালকদিগের ইহাতে আরও জিদ্ বাড়িয়া গেল এবং উত্তরোত্তর দুষ্টামির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা প্রথম হইতেই ইহাদের কুস্তী জিব্‌নাষ্টিক ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া কিছু বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল; পুনরায় যখন দেখিল যে, ইহারাই গায়ে পড়িয়া নিষেধ করিতেছে তখন তাহাদের দুষ্টামি আরও বৃদ্ধি পাইল। তাহারাও লড়াই করিতে প্রস্তুত হইয়া একটি দল গঠন করিয়া বাহির হইতে লাগিল। অগত্যা ইঁহারাও একদিন উহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য পরামর্শ করিলেন। সন্ধ্যার সময় দুই দলই বাহির হইল। প্রথম দুই একটি কথাবার্ত্তার পর দুই দলে তুমুল লড়াই বাধিল। আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী বালকগণ ততটা বলিষ্ঠ ছিল না। সুতরাং অত্যন্ত প্রহার খাইতে লাগিল। অবশেষে অনুপায় দেখিয়া যে যে দিকে পারিল, পলাইয়া গেল। কোট প্যাণ্টালুন ছিঁড়িয়া, টুপি হারাইয়া, পৃষ্ঠে ও গণ্ডদেশে অতীত যুদ্ধের চিহ্নসমেত, যে যাহার বাটীতে উপস্থিত হইল। ইঁহাদের মধ্যেও অনেকে উক্তযুদ্ধের স্মরণচিহ্ন সমেত বাটিতে ফিরিলেন। দুই তিন দিন আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী বালকগণ রাস্তায় বাহির হইলেই মারপিট গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। কয়েকজন আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী ইঁহাদের বিরুদ্ধে পুলিশে রিপোর্ট করিল। শেষ দুই দলের কর্ত্তৃপক্ষ

মিলিয়া মিশিয়া মিট্‌মাট করিয়া লইলেন। সেই অবধি আর্ম্মানী ও ফিরিঙ্গী বালকদিগের দুষ্টামি একরূপ ঘুচিল।

আর একবার একদিন অপরাহ্ণে সঙ্গী সকলে মিলিয়া ক্রিকেট খেলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কতকগুলি আর্ম্মানী বালক তাহাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছে। বৃদ্ধার করুণ ক্রন্দন শুনিয়া আর তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তখনই তিনি খেলা পরিত্যাগ করিয়া সদলে তাহাদের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন; এবং তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন। দুই দলে খুব মারপিট বাধিল। শেষ আর্ম্মানী বালকদিগকে নাকে কাণে খত দেওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু এই সময় একদিন হুগলীতে বক্তৃতা করিতে আসিলেন। ভবানীচরণ তাঁহাকে ফিরিঙ্গী ও আর্ম্মানী বালকদিগের দৌরাত্ম্যের কথা ও সকল ঘটনা জানাইয়া একটি সদ্‌যুক্তি চাহিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আপনিই এ বিষয়ের ভার লইয়া বলিলেন যে, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ সম্বন্ধে আবেদন করিবেন।

বিডন উদ্যানে একদিন বক্তৃতাকালে ইনি এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সুরেন্দ্রবাবুর মুখে এই আবেদনের কথাটি শুনিয়া সেই ছেলে বয়সেই মনে কেমন একটা অন্য ধারণা আসিয়াছিল। আবেদনে নিবেদনে কোন ফলই ফলিবে না, এটি সেই ছেলেবেলা হইতেই মনে ধারণা।

এই হইতেই ইঁহার মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মাথায় এক খেয়াল আসিল। দিনরাত ভাবনা—আমাদের দেশে আসিয়া, আমাদের অন্নে মানুষ হইয়া, আমাদেরই সঙ্গে বাদ, আমাদের সঙ্গে লড়াই! এত তেজ—এত অহঙ্কার! ইহার ঔষধ দিতে হইবে! কি করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে? প্রথম সৈনিক হইতে হইবে। যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া লড়াই করিয়া সব তাড়াইয়া দিব।

দিনরাত আপন খেয়ালে এই জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল। পড়াশুনা একরূপ ত্যাগ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে ভাবিয়া স্থির করিলেন, পশ্চিমে যাইয়া কোন রাজার অধীনে সৈনিক হইতে পারা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে; এই স্থির করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে ট্রেণে উঠিলেন। বাটীর লোকজন পূর্ব্ব হইতেই ভাবগতি দেখিয়া কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা পার্ব্বতীবাবু পেছু লইয়া পাণ্ডুয়ায় গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; এবং অনেক বুঝাইয়া বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন। বাটীর সকলে অনেক প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিচরণ বাবু, তখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার সঙ্গে রাখিলেন এবং নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া যাহাতে পড়াশুনার উপর পুনরায় ঝোঁক পড়ে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জেনারেল এসেম্ব্লী কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পড়াশুনা একরূপ চলিতে লাগিল। তবে মাথা হইতে সে খেয়াল দূর হইল না।

## আনন্দমোহন বসুর সহিত পরিচয়।

এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নূতন আন্দোলন তুলিলেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ঐ নূতন আন্দোলনে যোগ দান করিলেন। বক্তৃতায় দেশ মাতিয়া উঠিল। যুবকদলের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া গেল। বক্তৃতা হইবে শুনিলেই যুবকেরা দল বাঁধিয়া সেখানে যাইয়া হাজির হন। ইনিও সেই দলের মধ্যে একজন। বক্তৃতা না শুনিলে প্রাণটা যে হাঁপাইয়া উঠিতে থাকে। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া খুব হাততালি দিয়া যখন বাড়ীতে ফিরেন, তখন মনে হইতে থাকে—প্রাণটা যেন খালি খালি রহিয়াছে,

ভরে নাই। ঐ কাঁচা বয়সে প্রাণটা কেমন উড়ু উড়ু করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, স্বরেন বাঁড়ুয্যের সহিত ভারত-উদ্ধার করা কিছুতেই পোষাইবে না। কিন্তু কি করেন, ছেলে মানুষ; স্বরেন বাঁড়ুয্যের সহিত মতে মিলে না, ইহা প্রকাশ করিলেই লোকে জ্যেঠা বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

একদিন প্রাণের আবেগে আনন্দমোহন বসুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইঁহাকে চিনিতেন না। ইঁহার পিতৃব্য তাঁহার বিশেষ বন্ধু। পরিচয়ের পর তিনি প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত মতের মিল হইল না। ইনি একেবারে বলিয়া বসিলেন—Not through the pen but through the sword, অর্থাৎ কলমবাজিতে হইবে না, তলোয়ারে ভারত-উদ্ধার হইবে। তিনি এই উদ্ধত প্রকৃতি যুবার কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন—চুপ্ চুপ্—ঐ যে উনি সরকারি কর্ম্মচারী বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুর ডেপুটী ভগবান বাবু সেইখানে বসিয়াছিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে ইহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, মানবজাতি আর তত বর্ব্বর নাই; এখন সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে। বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি স্বাধীনতার দূতস্বরূপ, তাই একালে বৈধ আন্দোলনই (Constitutional agitation) যথেষ্ট। পাশবশক্তি প্রয়োগের আর আবশ্যক নাই। ইনি ত এই কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। অনেক আশা করিয়া গিয়াছিলেন—আনন্দবাবুর নিকট আপনার মত বজায় রাখিবেন, কিন্তু একেবারেই বিপরীত। বিফলমনোরথ হইয়া বাটীতে চলিয়া আসিলেন।

## সতের বৎসরের যুবার ভারত-উদ্ধার যাত্রা।

ভাবিতে লাগিলেন,—কোথায় যাই—কি করি! আবার শেষ অনেক

ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, গোয়ালিয়ার যাইয়া সৈনিক হইবেন; যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া ফিরিঙ্গী তাড়াইবেন। যাই এই খেয়াল আসিয়া উপস্থিত, অমনি গোয়ালিয়ার যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন এরূপ খেয়ালী-যুবার অভাব ছিল না। এক সঙ্গে চারিজন জুটিলেন। সঙ্গে টাকা কড়ি কিছুই নাই। দুই মাসের কালেজের মাহিনা দশ টাকা আছে। সঙ্গী আর তিন জন বন্ধুরও প্রায় ঐরূপ অবস্থা। এইরূপে চারিজনে বাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

সঙ্গে যাহা কিছু আছে তাহাতে চারিজনের ইটাওয়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া হইতে পারে। তাহাই হইল। ইটাওয়া ষ্টেশনে নামিয়া শুনিলেন, গোয়ালিয়ার সেখান হইতে ছত্রিশ ক্রোশ। ভারত-উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাণের আবেগ এত অধিক যে, কোন বাধা বিপত্তি মানিতে চাহে না। সে রাত্রি ইটাওয়ায় কাটাইয়া পরদিন গোয়ালিয়ার রওয়ানা হইলেন।

গ্রীষ্মকাল, সকাল বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। চারিজন সতের আঠার বৎসরের বাঙ্গালি যুবক ভারত-উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে চারিটি কি পাঁচটি টাকা আছে। কিন্তু হৃদয়ে সিংহবল। প্রথমেই যমুনা পার হইতে হইল। তারপর অনেক দূর হাঁটিয়া চম্বলনদী পাইলেন। চম্বল পার হইয়া আরও কিছুদূর গিয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পরিশ্রমে শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে। চারিজনে পরামর্শ করিলেন, দিনের বেলায় বিশ্রাম করিবেন ও রাত্রিতে পথ হাঁটিবেন। সঙ্গে বিশেষ কিছু আহার সঞ্চয় ছিল না। তেপান্তর মাঠ, বালি আর কণ্টকগুল্মে ভরা। একটা বোতলে কিছু ছোলা ভিজানো ছিল, আর কিছু ছাতু ও গুড় ছিল। তাহাই চারিজনে উদরসাৎ করিলেন। বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একদল হিন্দুস্থানী সেই পথ দিয়া যাইতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোথায় যাইবেন। ইহারা বলিলেন—গোয়ালিয়ার; সে বলিল, আমরা গোয়ালিয়ার-মহারাজের সিপাহী, ছুটির পর পুনরায় গোয়ালিয়ার যাইতেছি, আসুন আমাদের সঙ্গে চলুন। ইঁহারা বলিলেন—বড় রৌদ্র, রাত্রিতে পথ চলিব। সে হাসিয়া বলিল—এদেশে রাত্রিতে ভয় আছে, দিনমানেই ভাল। এ কথা শুনিয়া সকলে তল্পিতাল্পা হইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। রাস্তা আর ফুরায় না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল, তবুও সিপাহীরা চলিতেছে। ইঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তাহার উপর সিপাহীর সঙ্গে চলা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু কি হইবে—ভারত-উদ্ধারে বাহির হইয়াছেন, আর এইটুকু সহ্য করিতে না পারিলে চলিবে কেন! আর দুই দিন পরে ত সিপাহী হইতে হইবে, কত জলঝড় অবাধে সহ্য করিতে হইবে, কত মাঠ, বন, পাহাড়, পর্ব্বত পার হইতে হইবে, কতদিন অর্দ্ধাশনে অনশনে কাটিবে! এই ভরসায় নির্ভর করিয়া তাহাদের সহিত চলিতে লাগিলেন।

সিপাহীরা এইবার বড় রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ইঁহাদের মনে শঙ্কা হইল—ইহারা ডাকাত নয় ত। ইঁহাদের মধ্যে ইনি ও আর একজন কিছু বলশালী ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে অগ্রে রহিলেন আর পিছনে আর দুই বন্ধু রহিল। আর সিপাহীদের সহিত মিশিয়া চলিলেন না, একটু সরিয়া সরিয়া চলিতে লাগিলেন। খুব সতর্ক—যদি আক্রমণ করে তবে আটক করিবেন।

এইরূপে ভয়ে ভয়ে কিছু দূর গিয়া শেষ দেখিলেন যে, সিপাহীরা একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার সকল ভয় দূর হইল; দেখিলেন যে, এক প্রকাণ্ড কেল্লা। কেল্লার চারিদিকে ঐ গ্রামটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বড়ই আনন্দ—পথিমধ্যে সঙ্গে সিপাহী মিলিয়াছিল তাহার উপর আবার একেবারেই প্রথমে দুর্গতলে আশ্রয়

মিলিয়াছে। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ভগবান বড়ই সদয়; তা না হইলে এমন যোগাযোগ হইবে কিরূপে!

কেল্লাটির নাম গোহদ। গ্রামেরও নাম গোহদ। সে রাত্রি খাদ্য দ্রব্য কিছু পাওয়া গেল না; মিলিল কেবল মহিষের দুধের ডেলা ক্ষীর। তাহাই কিছু খাইয়া সেখানে শুইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়াই রওয়ান হইলেন। বেলা দশটার সময় এক গ্রামে পঁহুছিয়া স্নানাহারের যোগাড় করিতে লাগিলেন। বেলা চারিটার সময় পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে এক মুটিয়া তল্পিদার ছিল। সে আর চলিতে পারে না; অগত্যা মোট নিজেরাই ঘাড়ে করিলেন। ঐ মোট ঘাড়ে করিয়া বেগবতী পাহাড়িয়া নদী সকল পার হইতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ধ্যা আসিল, চাঁদ উঠিল, ঝুর ঝুরে দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। বরাবর চলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; তিনি গান ধরিলেন,—কত কাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে। আশার আলোক দশগুণে জ্বলিয়া উঠিল, মরমে মরমে বেদনার সাড়া হইল, প্রাণ যেন বিশ্বব্রহ্মণ্ডকে আবেগে সাপটিয়া ধরিল। এইরূপে শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে আনন্দে উৎসাহে অবশেষে গোয়ালিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খাস গোয়ালিয়ারকে লস্কর বলে। সিন্ধিয়া মহারাজের উহা রাজধানী। রাজধানীর এক ক্রোশের মধ্যেই ইংরেজের একটি ছাউনী আছে। উহাকে মুরার বলে। ইঁহারা প্রথমে ঐ মুরারের একটি সরায়ে বাসা লইলেন। পরদিন বাঙ্গালী বাবুরা সংবাদ পাইয়া এক কালীবাড়ীতে বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। পাঁচ সাত দিন এইস্থানে থাকিয়া লস্করে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; এমন সময় হঠাৎ এক দিন ইঁহাদের মধ্যে একজনের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি একজন পুলিশ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী। কেমন করিয়া তিনি এই সংবাদ পাইলেন এই ভাবিয়া সকলে অবাক্ হইলেন। শেষে বুঝিলেন, তাঁহারা এক বন্ধুকে দেশে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই চিঠি ধরিয়া তিনি এই ঠিকানা বাহির করিয়াছেন। যাহা হউক, আর নিস্তার নাই। ইনি ও ইঁহার আর একজন বন্ধু ইংরেজের ছাউনি হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—তোমরা নাবালক, যেখানেই যাওনা কেন সেখান হইতে ধরিয়া আনা হইবে। অগত্যা অল্পবয়সকে ধিক্কার দিয়া সকলে পলাইবার আয়োজন বন্ধ রাখিলেন, আর তিন চারি দিনের মধ্যেই দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

## কলেজে পুনঃ প্রবেশ।

বাটীর লোকে বিদ্যাসাগরের কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বিদ্যা-সাগরের কালেজে সুরেন্দ্র বাবু প্রফেসার। তাঁহার ইংরাজি পড়ানো শুনিবার জন্য কেলাসে ছেলে আর ধরে না—সকলেই উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ইঁহার কিছুই ভাল লাগে না। মন এমনই খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, খুব সিদ্ধি খাইতে আরম্ভ করিলেন। এত সিদ্ধি খাইতেন যে, কালেজেও নেশার ঝোঁক যাইত না। পুস্তকের গাদার আড়াল দিয়া বেশ নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাইতেন। কিন্তু একদিন ধরা পড়িয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখন সিদ্ধি খাইবেন না। তার পর সেই যে সিদ্ধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, আর কখন খান নাই।

## সুরেন্দ্র বাবুর অধ্যাপনা।

সুরেন্দ্র বাবুর অধ্যাপনা কালীন বক্তৃতায় ইঁহার মাথা একেবারে খারাপ করিয়া দিল। নিজের ভাবনা ছাড়িয়া পরের ভাবনা ভাবিতে শিখিলেন। দেশের ভাবনা ভাবিতে, পরের ভাবনা ভাবিতে, বড়ই মিষ্ট

লাগে। সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার বক্তৃতায় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন—আমাদের দেশে ম্যাট্‌সিনি গ্যারিবল্‌ডি কে হবে? অমনি চারিদিক হইতে করতালি পড়িয়া যায়, "All all—সকলে সকলে" এই ধ্বনি হইতে থাকে। এই সকলে প্রাণটি এমনি মাতিয়া উঠিল যে, মনে মনে স্থির করিলেন—বি-এ, এম্-এ পাশ করিবেন না, প্রাণপণ করিয়া ভারত-উদ্ধার করিবেন।

পড়াশুনা কিছুই ভাল লাগে না। কালেজে কেবল যান আর আসেন। এরূপে কিছুদিন কাটিলে আবার খেয়ালের ঝোঁক্ আসিল। এইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, আবার গোয়ালিয়ার যাইবেন, যোদ্ধা হইবেন, সুরেন বাঁড়ুয্যের বৈধ-আন্দোলন ছাড়িয়া তরবারির চমকে দিগ্‌দিগন্ত ঝলসাইয়া তুলিবেন, ফিরিঙ্গীকে চম্‌কাইয়া দিবেন।

## দ্বিতীয়বার ভারত-উদ্ধার-যাত্রা।

প্রাণের আবেগে আবার এক বৎসরের মধ্যে পড়াশুনা ছাড়িয়া গোয়ালিয়ার রওয়ানা হইলেন। এবার একাকী, সঙ্গে ত্রিশ বত্রিশ টাকা আছে। একেবারে আগ্রার টিকিট লইলেন। আগ্রায় পঁহুছিয়া তখনই ধোলপুরের টিকিট লইলেন। ধোলপুরে যাইয়া উমাচরণ বাবুর (সর্দ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়) বাটীতে নামিলেন। তিনি ধোলপুরের রাণার মাষ্টার। তিনি ইঁহার উদ্দেশ্য শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও ঈষৎ হাসিলেন। মনে মনে ইঁহাকে একজন পাগল ঠিক করিলেন। যুদ্ধ বিদ্যা শিখিব, লড়াই করিয়া দেশ স্বাধীন করিব, কি ভয়ানক কথা! যাহা হউক পাগল ঠিক করিয়াও তিনি খাতির যত্নের কিছু ত্রুটি করিলেন না।

তাঁহার বাটীতে আজ খাওয়া দাওয়ার কিছু বিশেষত্ব আছে। আজ ভেড়ার মাংস রাঁধা হইয়াছে। আহারের সময় একটি বড় বাটি ভরিয়া

মাংস ইহার সম্মুখে দেওয়া হইল। ইনি প্রায় পাঁচ বৎসর মাছ মাংস ছাড়িয়া দিয়াছেন, মাংস কি করিয়া খান! কিন্তু খাইব না একথা বলিতেও বড় লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ যুদ্ধ শিখিতে যাইতেছেন অথচ মাংস খান না, দুয়ে যেন মিলে না। অগত্যা লজ্জায় পড়িয়া পুরা বাটি পার করিলেন। পূর্ব্বস্বাদ জাগিয়া উঠিল আবার চাহিয়া লইলেন। এই মাংস খাওয়ার পরে আর কখনও মাছ মাংস খান নাই।

রাত্রিতে রাণার বাড়ীতে নাচ্ আছে। উমাচরণ বাবু সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু ইনি স্বীকৃত হইলেন না। মনে করিলেন, যে ভারত-উদ্ধারের ভার লইয়াছে, সে কখন নাচ্ তামাসা দেখে না।

ধোলপুর হইতে গোয়ালিয়ার আঠার ক্রোশ পথ। ঘোড়ার বা উটের গাড়ী পাওয়া যায়। ঘোড়ার গাড়ীর অনেক ভাড়া সুতরাং উটের গাড়ীতে চড়িলেন। উটের গাড়ীগুলি দোতলা। ইনি উপর-তলায় জায়গা লইলেন। রাত্রি দশটা আন্দাজ গাড়ী ছাড়িল। উটের ঘুড়ি ছুটিল—গাড়ীও বেগে চলিল—কিন্তু প্রাণ যায় যায়। এমন হেঁচকা টান যে, দম বাহির হইয়া যায়। ভারত-উদ্ধারের গোড়াতেই হেঁচকা টান। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সহিয়া গেল—উঠিয়া বসিলেন।

সেই উটের গাড়ীতে বসিয়া—আঠার বৎসরের বাঙ্গালি যুবকের মনে কতই না আশার কল্পনা জাগিতে লাগিল। চম্বল পার হইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য পড়িল। চারিদিকে বিজন প্রান্তর, মেটে মেটে পাহাড় ও গুল্মের ঝোপে পরিপূর্ণ। আশার কল্পনায় নানাবিধ খেয়াল আসিয়া জুটিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"কবে এই প্রান্তর মারাঠা অশ্বা-রোহীতে ছাইয়া পড়িবে আর আমি অশ্বারোহণে সেনাদল চালনা করিব। ঐ যে দূতেরা আসিয়া খবর দিল—শত্রু দল। তাদের বড় বড় কামান তোপ লইয়া আসিতেছে। আমি অমনি পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে হুকুম দিলাম—রাস্তার এক মাইল দূরে লুকাইয়া থাকিয়া যেন পাহারা দেয়।

শত্রুর চর দেখিলেই যেন তীরের দ্বারা তাহাকে খাল করে—বন্দুকের আওয়াজ না হয়। দুষ্‌মনেরা যেন মনে করে যে, প্রান্তরে জনপ্রাণীও নাই। আর এক হাজার সওয়ার লইয়া পাঁচ শত, পাঁচ শত করিয়া আগু পিছু—এক ক্রোশ ব্যবধানে—ঘাটি বাঁধিলাম। আর আমি মাঝখানে এক সহস্র সেনা লইয়া আড্ডা গাড়িলাম। শত্রু আসিল, দুই হাজার বন্দুক—পাঁচ সাত শত সওয়ার, ছয়টা বড় বড় কামান। প্রথম ঘাটি তাহারা পার হইল, মাঝের ঘাটির কাছে যাই তোপখানা আসিল, অমনি কামানের ঘোড়া আর গোলন্দাজগুলা ধরাশায়ী। একটীও বেশী গুলি ছাড়িতে হইল না—যে কয়টি ঘোড়া আর যে কয়জন গোলন্দাজ—ততগুলি আওয়াজ হইল, একটী অধিক নয়—একটি কম নয়। তার পরে এক মিনিটের মধ্যেই একেবারে গুলিবৃষ্টি—আগু পিছু মাঝখান হইতে একেবারে আগুন ছুটিতে লাগিল। তীরন্দাজরাও খুব কায করিল। যত বড় বড় পালকওয়ালা টুপি পরা জাঁদরেলদের টুপ্ টুপ্ করিয়া শুয়াইয়া দিল। তার পরে একেবারে রন্ রন্ ব্যাপার। সে যে তরোয়ারের চক্‌মকানি—দুষ্‌মন একেবারে কচুকাটা হইয়া গেল।” কল্পনায় এই রকম কতই ছবি আঁকিতে লাগিলেন।

এইরূপ নানাবিধ মানসসৃষ্টির আনন্দে উটের গাড়ীতে বসিয়া চলিলেন। সারারাত্রি চোখে একটুও ঘুম নাই। এখন বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী আর রমেশবাবুর বঙ্গবিজেতা-কাহিনীতে মন ভরিয়া রহিয়াছে। মনে করিতে লাগিলেন, যেন অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টিতে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়াছেন। কত বিপদ আসিতেছে, কত শত্রু নিপাত হইতেছে। মানসসৃষ্টিতে অনেকরকম ছবি দেখিলেন তবে কোন তিলোত্তমা আবিষ্কার করিলেন না বা কোন সরলাকে দেখিবার জন্য ঘাটে নৌকা ভিড়াইলেন না। এটুকু কঠোরতা ইঁহার ভারত-উদ্ধারে আছে।

শেষ প্রভাত হইল—নিদ্রা আসিল। একটু বেলা হইয়াছে; আর চালক বলিল—উঠো, গোয়ালিয়ার আ গেয়া। ধড়মড়িয়া উঠিয়া তল্পি-তাল্পা লইয়া নামিয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন কিছুই ঠিক নাই। প্রথমেই স্থির করিলেন, বাঙ্গালি বাবুদের নিকট যাইবেন না।

## সর্দ্দারের বাটীতে মাষ্টারি।

সহরের বড় রাস্তা দিয়া আর্ম্মানী যাইতে ছিলেন এমন সময় এক জন মারাঠী ব্রাহ্মণ ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চাকুরি করিবেন কি? একজন সর্দ্দারের ছেলেকে পড়াইতে হইবে। ইনি বলিলেন, আপনার ত আমার সহিত কোন পরিচয় নাই হঠাৎ এই প্রস্তাব কেন করিলেন! তিনি বলিলেন, পরিচয়ের প্রয়োজন নাই; বাঙ্গালী বাবুরা ভারি ইংরেজি জানে। একেবারে স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন। কোথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হইয়া যাইতেন, ভগবান আস্তানা ঠিক্ করিয়া দিলেন। তখনই সর্দ্দারের বাড়ীতে গেলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী ও বাগান। চাকরে একটী গভীর ইঁদারা (কূপ) হইতে সুশীতল জল তুলিতেছে। প্রাণ ভরিয়া স্নান করিলেন ও বাজারে গিয়া পুরী তরকারি মিঠাই খাইয়া আসিলেন। পরে সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা হইল। ত্রিশ টাকা মাহিনা ঠিক হইল। ছেলেটি বড় ছোট। কিন্তু একটি কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। বাটীর বাহিরে যাইবার হুকুম থাকিল না। কেবল ছেলেকে লইয়া বৈকালে বেড়াইতে যাইতে পারিবেন। দিন পাঁচ সাত কাজ করিলেন। সর্দ্দার খুব সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ভাবগতিতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে মহারাজের বড় প্রীতি নাই।

একটি ব্যাপার দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেকগুলি মুর্গী চরে। এদিকে সর্দ্দারসাহেব শিবপূজা করেন ও

খুব ফোঁটা কাটেন। ইনি তাঁহাকে একদিন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ঘরে মুর্গী কেন? তিনি বলিলেন—আমরা যে খাই। ইনি ত এই শুনিয়া অবাক্! পরে জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মণেতর মারাঠারা মুর্গী খায়।

সর্দ্দারের বাড়ীতে বেশ সুখশান্তি বটে কিন্তু ইঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বন্দীর মত থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল। সর্দ্দারের কাজ ছাড়িয়া দিলেন।

## গোয়ালিয়ারে বিদ্যালয় গঠন।

প্রথম পরিচিত মারাঠী ব্রাহ্মণের সাহায্যে সহরের আর এক ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। এই গৃহস্থের নাম বলবন্ত রাও। বলবন্ত রাও রাজসরকারে মুন্সীর কাজ করেন। বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। বাটীতে মা-ঠাকরুণ ও তাঁহার স্ত্রী আছেন—ছেলেপিলে নাই। মুন্সীসাহেব অল্প অল্প ইংরেজি জানেন। তিনি ইঁহার নিকট ইংরেজি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি এগার বৎসর ইংরেজি পড়িয়াছেন শুনিয়া সকলে ইঁহাকে ইংরেজি সাহিত্যে একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত মনে করিতে লাগিলেন। সহরে নাম প্রচার হইতে লাগিল। অনেক ব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট ইংরেজি শিখিবার জন্য রাত্রিকালে মুন্সীসাহেবের বাটীতে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। ছোট ছোট ব্রাহ্মণের ছেলেদের জন্য ব্রাহ্মণপাড়ায় একটি স্কুল খুলিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলেরা বিনা বেতনে পড়িতে লাগিল। একটি সওদাগরের ছেলে দশ টাকা বেতন দিতে লাগিলেন। ইহাতেই একরূপ খরচ চলিতে লাগিল। দুই বেলা ময়রার দোকানে যাইয়া পুরী দই বরফি খাইয়া আসিতেন। লস্কর সহরে একজন বাঙ্গালী বাবু ছিলেন। তিনি একজন ঠিকাদার। তাঁর বেশ দুপয়সা রোজগার ছিল। পুরী খাইয়া খাইয়া জিব্ আড়ষ্ট হইয়া

গেলে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া এক এক দিন ভাত খাইয়া আসিতেন। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন এখনও তাহার কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

## সিন্ধিয়া মহারাজের সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেলে একদিন সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দেখা হইল। আপনাকে সৈনিকশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট কথার উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি নামে সেনাপতি বটেন কিন্তু তাঁহার একটুও ক্ষমতা নাই। সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া ইঁহার অগাধ ভক্তি জন্মিল। কি সৌম্যমূর্ত্তি! সৌম্যশিষ্টতার ভিতরে এক অপূর্ব্ব অগ্নিময় তেজ সঞ্চারিত হইতেছে। চোখ দুটি যেন বহ্নিজ্বালা। সেনাপতির সরল বিনীত কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন; মর্ম্মাহত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সেনাপতির কোন ক্ষমতা নাই এই শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন, পরে অনুসন্ধানে জানিলেন—একবার গোয়ালিয়ারে দৃশ্যযুদ্ধ (mock fight) হয়। জয়াজী রাও মহারাজ—বর্ত্তমান মহারাজের পিতা এক পক্ষে—আর সেনাপতি আর এক পক্ষে; ঐ দৃশ্যযুদ্ধের উপলক্ষে মহাসমারোহ হয়। বড় বড় ফিরিঙ্গী সেনাপতি ঐ যুদ্ধ দেখিতে উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের রঙ্গ চলিতে থাকে—দুইজনেই বীর, রণকৌশলী। অবশেষে সেনাপতি মহারাজকে বেষ্টন করিয়া ফেলেন। মহারাজ ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন—বেলা দ্বিপ্রহর বাজিয়া গেল। তখন মহারাজ হুকুম করিলেন যে, তাঁর খানা আসিবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন—খানা যাইতে দিব না—মহারাজ যদি পরাজয় স্বীকার করেন ত খানা পাইবেন। মহারাজকে অগত্যা পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সেই অবধি মহা-

রাজের ক্রোধ সেনাপতির উপর পড়িল। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল।

সেনাপতির সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা। একদিন তিনি রাত্রিকালে ছাদে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ভেরীর উপর ভেরী। কিছুই বুঝা গেল না। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক মশাল হাতে করিয়া আসিতে লাগিল। ব্যাপার কি! জয়াজী রাও মহারাজ স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে ছাউনি পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন। তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর। ছাউনিতে গিয়াই দেখেন যে, সেনাপতি তাঁহাকে আহ্বান করিবার জন্য অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত। মহারাজ ছাউনি পরিদর্শন করিলেন আর বলিলেন—আমার রাজ্যে একজন মানুষ আছে—ঐ আমার সেনাপতি। সেনাপতির ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যাহাকে সেনার ভার দেওয়া হইয়াছিল—তাঁহার নাম সামশের খাঁ। তিনি অল্পবয়স্ক, কিন্তু ঘোর বিলাসী। পরদিন ছাউনিতে ঢেঁট্‌রা দেওয়া হইল যে, সকলেই হাজির ছিল কেবল শামশের খাঁ গর-হাজির। সেনাপতির সম্মান করা হইল বটে কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না। রাজসরকারে তখন কুচক্রীদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ!

## সঙ্কল্প ত্যাগ।

দ্বিতীয়বার যখন বিফল-মনোরথ হইলেন তখন এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন, স্থির করিলেন; সাধুসঙ্গ করিবার মানসে কিছুদিন নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল ঘুরিয়া শেষ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

## মেমারীতে মাষ্টারি।

কলিকাতায় কিছুদিন বাস করিয়া মেমারীতে মাষ্টারি করিতে

চলিলেন। মেমারী একটি ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। মাষ্টারি ছাড়িয়া ছিলেন।

মাষ্টারি ত্যাগ করিয়া জব্বলপুরে চলিয়া গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এইবার হিমালয়প্রদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ও সাধুসঙ্গ করিবার মানসে কিছুদিন পাহাড়ে পর্ব্বতে, বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন।

## ফ্রীচার্চ্চে মাষ্টারি।

কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন 'ফ্রীচার্চ্চ' স্কুলে মাষ্টারি করিলেন। মধ্যে মধ্যে ছেলে পড়াইয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। তাহার দ্বারা আপনার খরচপত্র একরূপ চলিয়া যায়।

বাটীতে বসিয়া সাহিত্যের আলোচনা চলিতে লাগিল। শত্রুবিনাশন-ভাব দূর হইয়া এইবার অন্যদিকে মতি ফিরিল। নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল।

## 'কন্‌কর্ডক্লাব' ও 'কন্‌কর্ড' পত্র পরিচালন।

এইবার 'কন্‌কর্ডক্লাব' নামে একটী সমিতি গঠন করিলেন এবং 'কন্‌কর্ড' নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্বদেশীয় যুবকবৃন্দের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের নানাবিধ উপায় আলোচিত হইতে লাগিল। খুল্লতাত পরলোকগত মহাত্মা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নামে মাত্র এই পত্রের সম্পাদক থাকিলেন। ইনি নিজেই সম্পাদকীয় সকল কাজই করিতে লাগিলেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি এই ক্লাবের সভ্য হইলেন। ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনা রীতিমত চলিতে

লাগিল। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির চর্চ্চাও বেশ চলিল। দিনরাতই ধূমধাম। কত গার্ডেন-পার্টির কত সভা-সমিতির আয়োজন হইতেছে। এই লইয়াই সদাই ব্যস্ত। দিনে একবার মাত্র বাটীতে আসিয়া আহার করিয়া যান। রাত্রের আহার প্রায় প্রতিদিনই ক্লাবে পৌছিয়া দিয়া আইসে। এইরূপে কিছুকাল ক্লাব ও এই পত্র ধূমধামের সহিত চলিল।

## কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

এই সময় কেশবচন্দ্র সেন আপন বাগ্মিতা-বলে দেশ একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। যে সকব যুবা হিন্দুধর্ম্ম মানে না অথচ খৃষ্টীয়-ধর্ম্মেও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাদের অধিকাংশই কেশব বাবুর অনুবর্ত্তী। এই সময় কেশব বাবু শিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী যুবকদিগের সহিত ঈশা, মুসা, গৌর, শাক্য, সক্রেটিশ, মহম্মদের পরিচয় করিয়া দিতেছেন। হিন্দুর পৌত্তলিকতার মধ্য হইতে মূলতত্ত্ব অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের খণ্ডভাব গ্রহণ, প্রাচীন প্রথানুযায়ী আরতি, স্তোত্র, শঙ্খঘণ্টা কাঁশর বাদ্য, ধূপ ধূনা পুষ্পমালা ইত্যাদি বাহ্যানু-ষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে একটি নূতন ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। ইংরেজি খৃষ্টানি হইতে মোহান্ধ যুবকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দু ও য়ুরোপীয় ভাবের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইংরেজি আলোক জ্বালাইয়া ইংরেজি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া চর্ম্মপাদুকান্বিত য়ুরোপীয়-ভাবাপন্ন লোকদিগকে শাস্ত্রপাঠ ও হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করাইতেছেন। একদিন হোম, একদিন জলসংস্কার, একদিন বা খৃষ্টের রক্তমাংস-ভোজন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি তাঁহার সারগর্ভ সুললিত তত্ত্বকথা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার যোগ, বৈরাগ্য ও ভক্তিদর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়া পড়ে। ইনিও তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ও ভাবময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার একজন

ভক্ত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মমন্দিরে রীতিমত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতাদিগের মধ্যে অনেকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। কেশব বাবু অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন; আপনিই নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় উত্থাপন করিয়া বুঝাইয়া দেন। কিছুদিন পরে কেশব বাবুর নিকট ইনি বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট ঈশা চরিতামৃত পাঠ করিয়া বাইবেলের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। কিছু দিন হিন্দুশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিলেন।

## রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশববাবুর পরিচয় হইয়াছিল। কেশব বাবু ও তাঁহার কতিপয় ভক্ত মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির ঠাকুরবাটীতে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনিও ইঁহাদের সহিত গমন করিয়া থাকেন। সেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগী চিরপ্রফুল্ল মহাপুরুষের উচ্ছ্বাসময়ী ব্রহ্মবিজ্ঞানের সরল তত্ত্বকথা সকল শ্রবণ করিয়া, আর তাঁহার সেই মাতৃনাম সম্বোধনে ভাবোন্মত্ত-অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনিও ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মাঝে মাঝে একেলা একেলা যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। ইনিও মধ্যে মধ্যে একেলা একেলা যাইয়া তাঁহার মুখে তত্ত্বকথা সকল শ্রবণ করিয়া থাকেন। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরমহংসদেবের বিষয় উল্লেখ করিয়া পরে তিনি একস্থানে আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ কে, তিনি কি জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন? এই নীচাশয়ের সহিত ঐ মহাপুরুষের বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয়ের কথা বলিতে গিয়া একজন কবির উক্তি

মনে উদয় হইতেছে। পরিচয়ের গর্ব্ব করিও না—যে কীট সে কীট—যদিও সে রাজমহিষীর কেশগুচ্ছে বাস করে। ভগবান রামকৃষ্ণ সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষ। এরূপ সাধন ও সিদ্ধি বহুকাল অবধি পুণ্যভূমি ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে লাভ করিয়া ভারত ধন্য হইয়াছে—বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহার কামিনীকাঞ্চনে বিরাগের কথা স্মরণ করিলে প্রাণমন উদাস হইয়া যায়। তাঁহার অদ্বৈতসমাধি ভাবিলে সকল ভেদবিরোধ বিস্মৃত হইতে হয়। তাঁহার ভক্তিময় হুঙ্কার-মুখরিত নর্ত্তনদৃশ্য চিত্তপটে উদিত হইলে পাপতনুও পুলক রোমাঞ্চে কদম্বাকৃতি ধারণ করে। তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শে আমি ধন্য হইয়াছি। তাঁহার শ্রীচরণযুগল আমার পাপ অঙ্গে তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন—আমার গণ্ডদেশে করকমল সঞ্চালন করিয়া এই হতভাগ্যকে আদর করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ও উপদেশ, বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, তিনি কোন নূতন যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন নাই। যে ব্রাহ্মী-স্থিতির কথা গীতাতে বর্ণিত আছে—যে অহৈতুকী ভক্তিতত্ত্ব ভাগবতে গীত হইয়াছে—তাহাই তিনি জীবনে সিদ্ধ করিয়া পাপ পৃথিবীকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন।

## ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ।

পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। কেশব বাবুর দেহত্যাগের পর এই ধর্ম্মের প্রতি আরও মমতা বৃদ্ধি পাইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে দেশদেশান্তরে প্রচারিত হয় তাহার জন্য যত্নবান হইলেন। অবশেষে আপনি ও এক বন্ধু দুইজনে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে সিন্ধুদেশ যাত্রা করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

## সিন্ধুদেশে অবস্থান।

কিছুদিনের মধ্যে দুইজনে সিন্ধুদেশ যাত্রা করিলেন। এখানে

আসিয়া ওজস্বিনী বক্তৃতাদি দ্বারা অনেককে আপনার ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

## ইউনিয়ান একাডেমী প্রতিষ্ঠা।

কিছুদিন পরে এখানে ইউনিয়ান একাডেমী নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। হীরানন্দ নামে সিন্ধুদেশবাসী এক বন্ধুকে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। আর এক বন্ধুকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। আপনিও সময় ও সুবিধা অনুযায়ী বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। এই স্কুলটি এখনও বিদ্যমান আছে। তবে প্রধান শিক্ষক হীরানন্দের মৃত্যুর পর হইতে ইহা 'হীরানন্দ একাডেমী' নামে অভিহিত হইতেছে।

## পিতৃ-বিয়োগ।

এই সময়ে পিতার অত্যন্ত অসুখের সংবাদ পাইলেন। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পিতা মুলতানে আসিয়াছেন। ইনিও মুলতানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মুলতানে আসিবার কয়েকদিন পরেই পিতার মৃত্যু হইল। জ্যেষ্ঠ বা মধ্যম ভ্রাতা কেহই উপস্থিত ছিলেন না, নিজেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কয়েকদিন পরে পুনরায় করাচীতে আসিয়া আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

## প্লেগরোগী শুশ্রূষা।

এই সময় এখানে অত্যন্ত প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হইল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র অসহায় প্লেগরোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পল্লী, গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতে লাগিল। বাটীঘর শ্মশানে পরিণত হইল। এমন বাটী অবশিষ্ট রহিল না যে, সেখানে ক্রন্দনের রোল উঠিল না। গৃহস্বামী রোগাক্রান্ত স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া পলা-

ইতে লাগিল। পুত্র মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন পিতামাতাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। গৃহলক্ষ্মীর আকুল ক্রন্দনে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চারিদিকে যেন এক মহামারীর বিভীষিকা নর্ত্তন করিতে লাগিল। লোকজনপূর্ণ অনেক বাটীরও এমন অবস্থা হইল যে, শেষ শব টানিয়া বাহির করিবার কেহ অবশিষ্ট রহিল না। গভর্ণমেণ্ট হইতে যাহাতে সত্বর এই রোগ নিবারণের একটি সুব্যবস্থা হয় তাহার জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাত্রি নাই, দিন নাই, সংবাদ আসিলেই ঔষধ পথ্যাদি সমেত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। কত প্লেগরোগী যে ইঁহার ক্রোড়ে মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভ করিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এই সময় যিনি ইঁহার শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি একবার দেখিয়াছিলেন, তিনিই বুঝিয়াছিলেন যে ইঁহার হৃদয় পরের দুঃখে কতটা ব্যথা অনুভব করে—পরের মঙ্গলের জন্য ইঁহার হৃদয় কতটা আত্মহারা হইতে পারে।

ইঁহার রীতিমত চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টের এ দিকে দৃষ্টি পড়িল ও রোগ-নিবারণের সুব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব একরূপ হ্রাস হইল। এই সমবেদনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এইবার এখানে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। অনেকেই ইঁহার ভক্ত হইয়া পড়িল।

সিন্ধুদেশে প্রায় আট দশ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ক্রমে এখানকার ভাষাও বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন; সিন্ধি ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে ও চিঠিপত্র লিখিতে পারিতেন। এই ভাষাতে কয়েকটি সুন্দর গীতও রচনা করিয়াছিলেন।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ।

### ফিনিক্স্ ও হার্ম্মনীপত্রের সম্পাদকতা।

এই সময় ইঁহার এক বন্ধু করাচী হইতে প্রকাশিত ফিনিক্সনামক সংবাদপত্রের সম্পাদক-পদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত অনুরোধ করিয়া ধরিলেন। অনেক আপত্তি থাকিলেও তিনি অবশেষে এই পদ গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন হার্ম্মনী পত্রের সম্পাদকের কার্যও করিলেন।

### যিশুখ্রীষ্ট ও বাইবেল গ্রন্থ।

যিশুখ্রীষ্ট ও বাইবেল গ্রন্থের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নানারূপ আলোচনা করিতেন। তাঁহার এ বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার কোন কোন বন্ধু কখন কখন উপহাস করিয়া বলিতেন যে, ভবানী কালে খৃষ্টান হইয়া যাইবে। বন্ধুরা যাহা উপহাস করিয়া বলিতেন, এখন তাহা সত্যে পরিণত হইল; ক্রমে যতই তিনি এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই এই ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে এই সিন্ধুদেশে বাসকালেই খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

### সোফিয়া-পত্র প্রচার।

এই সময় তিনি নিজেই সোফিয়া-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে হিন্দুদর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল।

## প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম।

প্রথমে তিনি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মনের তৃপ্তি হইল না। তিনি হিন্দুসন্তান, তিনি উচ্চাঙ্গের ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান ভাল বাসেন। কিন্তু এদেশ-প্রচলিত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মে সেরূপ উচ্চাঙ্গের ভক্তি বা তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ কিছু লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

এদেশে-প্রচলিত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয়ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি বিস্তীর্ণ লীলাক্ষেত্র-বিশেষ। ব্রহ্মচর্য্যের ইহাতে স্থান নাই। যে ঋষিকুল সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই বংশে জন্ম, সুতরাং ইহাতে তাঁহার মন বসিবে কেন? তিনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার মনোমত কিছু পাওয়া যায় কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ছয় মাস কাল বিশেষ আলোচনা করিয়া মনোমত অনেক বিষয় উপলব্ধি করিলেন।

## ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ।

কিছুদিনের মধ্যেই করাচি সহরের রোমান ক্যাথলিক এক পাদ্রীর দ্বারা ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

## 'ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়' নাম-গ্রহণ।

এই সময়ে গৃহস্থাশ্রম-প্রচলিত 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' এই নাম ত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়' এই নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা ধারণ করিলেন এবং এই ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিলেন ;—

I have adopted the life of Bhikshu (mendicant) sannyasi. The practise prevalent in our country. is to adopt a new name along with the adoption of a religious

life. Accordingly I have adopted a new name. My family surname is Vandya (praised) Upadhayaya (teacher lit, sub-teacher ), and my baptismal name is Brahma-bandhu ( Theophilus ). * I have abandoned the first portion of my family surname, because I am a disciple of Jesus Christ, the Man of Sorrows, the Despised man. So my new name is Upadhayaya Brahma-bandhu. I hereby declare that, hencefoward, I shall be known and addressed as Upadhayaya Brahmabandhu or, in-short Upadhayayaji, and not Banerjee, which is an English corruption of the first portion of my family surname Vandya-ji.

Sophia. No 12, December 1894.

ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিনি এই ধর্ম্মসম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ যতই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই এই ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিতে লাগিল। সাধারণ লোক হইলে উপাধ্যায় অপরাপর শত শত ভদ্রবংশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় একটী উচ্চ বেতনের পাদ্রীপদ গ্রহণ করিয়া বেশ সুখে ও সম্ভ্রমে কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু উপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের দয়া সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। জগতের মধ্যে একটি মহৎ কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে। তাই ভগবান তাঁহাকে সুখসম্ভ্রম প্রভৃতি বাহ্য সম্পদের লালসা হইতে মুক্ত রাখিলেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বাহ্য সুখসম্ভ্রমের জন্য লালায়িত হইলেন না। তিনি এই খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-

* This saint was a special devotee of the Blsssed Trinity in the 2nd century.

তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধর্ম্ম যাহাতে বহুলপ্রচারিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

## ঘাতপ্রতিঘাত ও সত্যের উপলব্ধি।

তিনি ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং এই ধর্ম্ম যাহাতে বহুল রূপে প্রচারিত হয় তাহার জন্য যত্নবান হইলেন। কিন্তু এই ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া তিনি প্রথমে ঘোর বেদান্ত-বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। বেদান্তের বিরুদ্ধে অনেক কূটতর্কের অবতারণা করিয়া সোফিয়া-পত্রে নানাবিধ আলোচনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক কথায় তিনি এখন পৃথিবী-প্রচলিত সকল ধর্ম্মের মধ্যে এই খৃষ্টীয়ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু অভিমন্যুর ন্যায় তুমুল সংগ্রামে সপ্তরথিপরিবৃত হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতে সুতীক্ষ্ণ বাণে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন। যতই তিনি ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলেন, ততই অদম্য উৎসাহের সহিত কূটতর্কের আবিষ্কার করিবার জন্য বেদান্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন; এবং এই আলোচনা করিতে গিয়া ক্রমে তিনি ঊর্ণনাভের ন্যায় আপনার জালে আপনিই আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

এই সময় একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ জগতে হিন্দুর বেদান্ত প্রচার-সঙ্কল্পে এক বিরাট আয়োজনের অনুষ্ঠান করিলেন। অপর দিকে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ঐ বেদান্তকে অতিক্রম করিয়া ভারতে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান হইলেন। উপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজির বেদান্ত-মতের বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রবন্ধও সোফিয়া পত্রে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং বেদান্তের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তিনি অতীব বুদ্ধিমান, তাই এখন বেদান্তের সাহায্যে ভারতে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারেরর উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

## ধৰ্ম্মমত পরিবর্ত্তনের হেতু।

উপাধ্যায় মহাশয় যে বেদান্তবিদ্বেষী হইয়াছিলেন তাহার এই বিশেষ কারণ—প্রথম যৌবনে যখন তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠে, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তিনি কেশববাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেশব বাবুই তখন নব্য যুবকদলের একমাত্র ভরসা। সেই সময় যদিও তিনি হিন্দুধর্ম্মের কিছু কিছু আলোচনা করিলেন কিন্তু সে সমস্তই রঙ্গিন চশমার মধ্য দিয়া। উপরিভাগের কিছু শিক্ষা করিলেন বটে কিন্তু ঐ এক কারণে হিন্দুধর্ম্মের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যতটুকু পারিলেন, সেইটুকু সর্ব্বস্ব বলিয়া ধারণা করিয়া লইলেন। পরন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার শান্তিলাভ হইল না। সত্যের অনুসন্ধানে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল; এবং এই ব্যাকুলতায় কিছুদিন পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। এই জন্যই অনুমান হয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজের অপর দুই শাখা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টভক্ত কেশবচন্দ্রের পরিচালিত শাখায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আমাদের অতীব দুর্ভাগ্য যে, উপাধ্যায়ের ন্যায় ত্যাগী, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিকে আমরা কিছুকাল হারাইয়াছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও যদি আজীবন হিন্দুধর্ম্মের সেবা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি বা এই ম্লেচ্ছভাব দূর হইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন।

## হিন্দু ও খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বিরোধ-স্থল।

বিশেষ আলোচনায় তিনি দেখিলেন যে, যেখানে উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-ভক্তির সহিত পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে, সেখানে অন্য ধর্ম্ম প্রচারিত

হওয়া সম্ভব নয়। সাধু-পল, সাধু-যোহন এবং তাঁহাদের পদাঙ্কানুযায়ী পরবর্ত্তী রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের আচার্য্যগণ, গ্রীক্ দর্শনের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই য়ুরোপে অতি সহজে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জগতের মধ্যে চারিটি ধর্ম্ম বিশেষ প্রবল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয়। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকতার প্রকারান্তর বলা হইলেও কতকগুলি বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার সামঞ্জস্য রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই ইহা একরূপ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মের মধ্যে আর সে বাল্যের বা যৌবনের চাঞ্চল্য নাই। এখন বয়োবৃদ্ধিসহকারে স্থির, ধীর হইয়াছে। এখন কাহাকেও আবাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে না বা কাহাকেও বিসর্জ্জন করিবারও প্রয়াস পায় না। যদিও এশিয়াই সকল ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থল কিন্তু খৃষ্টীয়ধর্ম্ম য়ুরোপে যাইয়াই কার্য্যকরী হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছে। বারবার অনার্য্যদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়া দেশের মধ্যে এক উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তপাত একটি নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মকর্ম্ম, ভগবৎ-চিন্তা একরূপ ছিল না বলিলেও চলে। এমন সময় ধীরে ধীরে এই ধর্ম্ম আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া এই অনার্য্য আসুরিক ভাব কতকটা বিদূরিত করিল; গ্রীকদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিল। যদিও য়ুরোপীয় চিন্তা-প্রণালীর উৎপত্তি-স্থান গ্রীসদেশ, কিন্তু অধুনা পুরাতন গ্রীক ও য়ুরোপীয় ধর্ম্মে স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে।

চিন্তা-প্রণালী ও ধর্ম্মমত এক নহে। ভারতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে বটে কিন্তু বিশেষরূপে

আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই একই চিন্তাস্রোত সকলের মূলে প্রবাহিত হইতেছে।

মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার কার্য্যকারিতা ও চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা পরিচয় লইতে হয়। কার্য্যকারিতা ও চিন্তাপ্রণালীর সহিত মিল হইলে তবে লোকে তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করে। প্রথমতঃ হিন্দু, খৃষ্টান এই নাম শুনিলেই চমকিত হইয়া উঠেন। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহারা য়ুরোপীয় আচারব্যবহার ও চিন্তা-প্রণালীর সহিত ধর্ম্মমত এক করিয়া ফেলেন। খৃষ্টান—এই কথা শুনিলেই হেটবুট-কোট-প্যাণ্টালুনধারী, ব্রাণ্ডীবিয়ারসেবী, গো-শূকর-ভোজী, কদাচারী বিসদৃশ এক জীব মনোমধ্যে আবির্ভূত হয় এবং তাহাতেই আড়ষ্ট হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুসমাজ নিবৃত্তির শাসনে পরিচালিত। নিষ্কাম কর্ম্মসাধন হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দু 'জগৎ মিথ্যা' এই পরমতত্ত্ব বুঝিয়াছে, তাই পার্থিব সকল বস্তুতে তাহারা উদাসীন। অন্তঃপ্রকৃতিকে দমন করিয়া শান্ত, স্থির, ধীর হইয়াছে। আর য়ুরোপীয়েরা হুড়্দুম, দৌড়ঝাঁপই ভাল বাসেন। বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিতে গিয়া অন্তর-প্রকৃতির নিকট পরাস্ত হইয়া তাহার দাসত্ব করিতেছেন। সদাই ইহার পূজার উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। ঈশ্বর ও সংসার দুইটিই সমানভাবে বজায় রাখিতে চাহেন এবং সেই জন্যই হিন্দুর বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবাদ একেবারেই উড়াইয়া দিয়া নাস্তিক বৌদ্ধমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে এইগুলিই আসুরিক ভাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইস্থানে হিন্দুদিগের সহিত য়ুরোপীয় ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

তিনি এই বিষয়টি বিশেষরূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়া ও এই দুই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ হিন্দুজ্ঞানের শীর্ষদেশ বেদান্তদর্শনের সহিত ও হিন্দু সন্ন্যাস-ধর্ম্মের সহিত, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার জন্য একটি উচ্চ জ্ঞান-পন্থা উদ্ভা-

বনে প্রবৃত্ত হইলেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারের এই নূতন উচ্চ পন্থা সোফিয়া পত্রে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদান্তের সাহায্যে খৃষ্ট ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে নবভাবে প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

## ইসাপন্থী-নামক সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গঠনের উদ্যোগ।

এই সময়ে তিনি আরও একটি গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। য়ুরোপে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিগণ যেমন বিবিধ খৃষ্টীয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ ভারতবর্ষে ইসাপন্থী নামে নূতন একটি খৃষ্টীয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সমাজের প্রথমাবস্থায়, প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ য়ুরোপে যেরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও ঠিক সেই কার্য্যেরই সূচনা করিলেন।

একটি আশ্রম করিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু মনোমত স্থান কোথাও মিলিল না। অবশেষে বহু অন্বেষণের পর মধ্য প্রদেশে আসিয়া জব্বলপুরে নর্ম্মদাতীরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নাগপুরের ক্যাথলিক বিশপ ডাক্তার পেল্‌ভাটের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন। অনুমতি পাইলেন, আশ্রমের জন্য স্থানও পাইলেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন হইয়া উঠিল। অর্থ সংগ্রহের জন্য নানাস্থানে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য, বক্তৃতাদি দ্বারা সাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপযুক্ত অর্থ

সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াও যখন কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না, তখন স্থির করিলেন, মাদ্রাজে যাইয়া আপন উদ্দেশ্য প্রচার করিবেন।

## মাদ্রাজ কর্ম্মক্ষেত্র।

মাদ্রাজে আসিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় খৃশ্চিয়ান কালেজে (Hinduism and Christianity) হিন্দুধর্ম্ম এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-বিষয়ক এক বক্তৃতা করিলেন। আপন উদ্দেশ্যও বক্তৃতায় প্রচার করিলেন। দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও সভাপতি হইলেন। এটি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রধান দেশ সুতরাং এতদিন পরে তাঁহার বক্তৃতা ও পরিশ্রমের কিছু ফলও ফলিল; কিছু অর্থের সংস্থান হইল। কিন্তু যেরূপ মহৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার পক্ষে এ কিছুই নয়। এখান হইতে তাঞ্জোর ও পরে টুটিকোরিন যাইয়া বক্তৃতায় আপন উদ্দেশ্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া টুটিকোরিনে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দলে দলে তাঁহার নিকট লোক আসিতে লাগিল। একদিন তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দ্বারা শোভিত করিয়া পাল্কীতে বসাইয়া তাহারা সহর প্রদক্ষিণ করিল। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টানগণ এই সকল দেখিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগকে মানব-উপাসক বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ক্যাথলিক পুরোহিতগণ, প্রোটেষ্ট্যাণ্টদিগকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে, ইহাতে ধর্ম্মে কোন দোষস্পর্শ করে না। ক্যাথলিক ধর্ম্মের কোন অঙ্গ-হানি হয় না; এইরূপে তিনি মাদ্রাজের সহরে সহরে বিশেষ আদর, অভ্যর্থনা ও প্রতিপত্তির সহিত আপন উদ্দেশ্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মাদ্রাজ হইতে জব্বলপুরে চলিয়া আসিলেন।

## নর্ম্মদাতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল, তদ্দ্বারা নর্ম্মদাতীরে একটি ক্ষুদ্রায়তন

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। কয়েকজন ভক্ত আসিয়া তাঁহার এই আশ্রমে যোগদানও করিলেন। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় যেরূপ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ এখানে একটি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ভারতের স্থানে স্থানে আপন নবপন্থানুযায়ী এই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ব্রতী হইলেন।

আশ্রমবাসিগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলেই একমত, সকলেরই তুল্য অধিকার থাকিল। কিন্তু হিন্দুর বর্ণধর্ম্মানুযায়ী আচার ব্যবহারে যাহার যতটুকু অধিকার তিনি ততটুকু অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। আহারাদি ও বাসস্থান বর্ণভেদে পৃথক্ থাকিল।

তিনি খৃষ্টান হইয়াও যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এতটা পক্ষপাতী তাহার কারণ আর কিছুই নয় তিনি একজন উচ্চস্তরের হিন্দু ব্রাহ্মণ, এবং সেই জন্যই এই জাতীয় সংস্কারটি তাঁহার দূর হয় নাই।

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ ছিল যে, নিম্ন লিখিত একটি উদাহরণ দ্বারা উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

তিনি যখন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় গঠন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্থানীয় একটি মিশনরী বিদ্যালয়ের জন্য গণিত-বিদ্যা-পারদর্শী একটি শিক্ষকের প্রয়োজন হইল। ইঁহার সহিত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি ইঁহার নিকট একটি ভাল শিক্ষকের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। উপাধ্যায় মহাশয় আপন এক শিষ্যকে ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইলেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষকের জন্য কিছু বেতন ও কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জলযোগ দুধ আর কলা এই মাত্র। উপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব অবগত হইয়া আপন শিষ্য সেই শিক্ষককে বলিলেন ম্লেচ্ছের দাতব্য যা কিছু খাদ্য

সকলই অস্পৃশ্য ও অখাদ্য। তিনি যাইয়া উপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি প্রকাশ করিলেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু ব্যথা পাইলেন ও কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। সুতরাং উক্ত শিক্ষকের সে স্থানে আর কার্য্য হইল না।

তিনি আপনি সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আহারাদি গ্রহণের বিশেষ কোন বিধিনিষেধ নাই। সেই জন্য তিনিও এ সকল কিছুই মানিতেন না, কিন্তু আপন শিষ্য বা অনুগতদিগের মধ্যে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে, তিনি চিরদিনই একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন ইহা অতি সত্য। এবং এই সকল অঙ্কুর পরে পত্রপুষ্পফল দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল।

## হিন্দুর উদারতা।

তিনি সন্ধ্যার মধ্যে এক স্থানে, পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া হিন্দুর উদারতা সম্বন্ধে এই বলিয়াছিলেন—আমরা ইংরেজি ইতিহাসে পড়ি যে হিন্দু জাতি বড় অনুদার। তাহার প্রাণটি এমনি সঙ্কীর্ণ যে অপর জাতির জল পর্য্যন্ত গ্রহণ বা স্পর্শ করে না। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়। আর এই অনুদারতার ফল কি হইয়াছে! ম্লেচ্ছের জল না খাইয়া লাথি খাইতে হইতেছে। এই নিন্দা প্রথমে বড় যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। নিজেদের প্রতি ঘৃণা ধরে। সকল বন্ধন ভাঙ্গিয়া হোটেলে গিয়া খানা খাইতে ইচ্ছা করে। সাহেবের সঙ্গে এক টেবিলে খাইতে বড় গৌরব মনে হয়। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ম্লেচ্ছের জলস্পর্শ করে না বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় অত্যন্ত উদার ও প্রেমিক। উদার কে? যাহার বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্রের বিরোধ মিটিয়া যায়—যাহার অংশতা লাভ করিয়া সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যায়—সেই উদার!

আর যাহার তাহার সঙ্গে মিশিয়া নিজে যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে অথবা অন্যকে নাশ করিবার জন্য আক্রমণ করে, সে উদার নহে।

মার্কিনের তাম্রবর্ণ জাতিরা হিস্পানীদিগের সহিত মিশিয়া নিজত্ব হারাইয়াছে। আমাদের দেশে ফিরিঙ্গীরাও সেইরূপ। আর পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয়েরা যেখানে গিয়াছিল সেই থানেই পুরাতন জাতিদিগকে নাশ করিয়াছে, ইংরেজের সম্পর্কে মার্কিনের ও অস্ট্রেলীয়ার আদিম-বাসিগণ অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছে। এ প্রকার বিস্তারকে উদারতা কহে না। ভারতে কত প্রকার জাতি না আসিয়া মিশিয়াছে! কোন দেশে বোধ হয়, এমন জাতিসংঘর্ষ হয় নাই। অনার্য্য তুরানীয় বক্ত্রীয় হুন শক প্রভৃতি অনেক জাতি ভারতে আসিয়াছিল কিন্তু সেই সমস্ত জাতিকে ভারত আপনার উদার বক্ষে মিশাইয়া লইয়াছে। প্রথমে হিন্দু দূরে থাকে। ভিন্নজাতিদিগের সহিত পান আহার করে না। কিন্তু যেমন ক্রমশঃ তাহারা হিন্দুকে সম্মান করিতে শিখে, হিন্দুর সভ্যতা হিন্দুর মর্য্যাদা বুঝিতে পারে—অমনি তাহারা পরস্পরের ক্ষুদ্রতা ও বিরোধ হারাইয়া হিন্দুর উদার ক্রোড়ে স্থান পায়। তাহাদের সহিত আহার পান ও বিবাহাদি চলে। সংহিতা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, প্রথমে শূদ্রদিগের সহিত জলাচরণ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম ছিল। কিন্তু যেই আর্য্যদিগের সম্পর্কে তাহারা সভ্য ও সুশীল হইয়া আসিতে লাগিল, অমনি তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত ও বর্ণাশ্রমে অধিকার পাইল।

অনার্য্যদিগের সহিত যদি প্রথম হইতেই মিলন হইত, তাহা হইলে আর্য্যজাতি ভ্রষ্ট হইয়া যাইত। ইংরেজ তাহার জুতাবরদারের হাতে খাইতে পারে কিন্তু তাহাকে জুতাও মারিতে পারে। আর আমরা যাহার সহিত খাই তাহার সহিত আমাদের সামাজিকতা দাঁড়াইয়া যায়। তজ্জন্যই আমাদের আহারপানসম্বন্ধে শক্ত বিধি। যে জাতি আমাদের

সম্মান না করে, তাহাদের সহিত আমাদের মিলন হইতে পারে না। অনার্য্য হূন শকেরা নষ্ট হইয়া যায় নাই কিন্তু আর্য্যসংহিতার বন্ধনে একীভূত হইয়া হিন্দুত্ব লাভ করিয়াছে। মুসলমানেরা আসিয়াছিল। তাহাদের বস্ত্র পরিচ্ছদ কলাবিদ্যা অনেক পরিমাণে লওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাদের জল ছুঁইতে বারণ। কেন না সে হিন্দুকে মানে না। যদি সংহিতাকারগণ ঐরূপ কঠোর না হইতেন, তাহা হইলে জলের ছুতা করিয়া মুসলমানেরা হিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিত ও সব একাকার হইয়া যাইত, হিন্দুত্ব লোপ হইত। সেইরূপ ইংরেজদের সহিত আমরা সাবধানে ব্যবহার করিব। রাজা বলিয়া সম্মান করিব—আগন্তুক বলিয়া সদ্ভাব রাখিব—কিন্তু যতদিন না হিন্দুকে গুরু বলিয়া মানে, হিন্দুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা না করে, ততদিন আমাদের সহিত তাহাদের মিলন হইবে না। যে হিন্দুসন্তান ইংরেজের সঙ্গে মান হারাইয়া খানা খাইতে যায়, সে হিন্দুর মর্যাদা জানে না। কি অপমান! ইংরেজ তোমার বাটীতে আসিয়া তোমার অন্নব্যঞ্জন খাইবে না, আর তুমি সাহেব সাজিয়া ইংরেজের বাটীতে ইংরেজের খানা খাইয়া এস। পুরাতন কথা সব ভুলিয়া গিয়াছ! হিন্দু আপনার সম্মান রাখিয়াছিল বলিয়াই ধীরে ধীরে আর্য্যজাতির অভেদ বিশালতায় কত জাতি না আশ্রয় লইয়াছে। হিন্দু আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মুসলমানের সহিত আহার পান করে নাই বলিয়াই জাতীয়তা রক্ষা পাইয়াছে।

আমাদের সম্রাটের হিন্দুস্থানী আরদালীও হিন্দুজাতির গুরুত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে। সম্রাটের জন্য প্রাণ দিবে কিন্তু ম্লেচ্ছ রাজরাজেশ্বরের জল গ্রহণ করে না। কি মহান্ দৃশ্য। কিন্তু আমাদের সাহেবীভূত নব্য-দলেরা জাতিমর্য্যাদা হারাইয়া ইংরেজের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন।

হিন্দু বাহিরের উচ্ছৃঙ্খল উদারতা দেখাইতে চাহে না। হিন্দু সর্ব্বজনমান্য ও সকলের গুরুস্থানীয়। সে কাহাকেও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস

পায় না অথচ ইন্দ্রিয়ঘটিত সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে না। কিন্তু সকলকে তাহার অভেদ ভাবময় হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বিরোধ সংহার হইতে বাঁচাইয়া অমরত্ব প্রদান করে।

## আশ্রমের অস্তিত্ব-লোপ।

আশ্রমের ব্যয়বহনের জন্য তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোটামুটি কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ছয়মাস কাল এইরূপে চলিবার পর অবশেষে এই আশ্রমের অস্তিত্ব লোপ পাইল।

নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না তখন মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইংলণ্ড যাইয়া এই নূতন পন্থা প্রচার করিবেন। এবং যদি সেখানে বিশেষরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে শেষ তাঁহাদের সাহায্যে ইতালী যাইয়া পোপের নিকট এই সকল বিষয় জ্ঞাত করিবেন ও তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসিবেন। তাহা হইলে অর্থের জন্য আর বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

## প্রথম বিলাতযাত্রার আয়োজন ও দৈব দুর্ব্বিপাক।

আপনি ও আপনার এক শিষ্য উভয়ে বিলাত যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। পাথেয় সংগ্রহের জন্য বোম্বাই যাত্রা করিলেন। বোম্বাই ও করাচী সহরে কিছুদিন চেষ্টা করিয়া পাথেয় একরূপ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক ঘটিল। হঠাৎ কণ্ঠদেশে একটি স্ফোটক দেখা দিল। উহাতে প্রায় মাসাবধি যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। ক্রমে সুস্থ হইলেন বটে কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় শুভকার্য্যে বাধা পড়িয়াছে, এই অনুভব করিয়া সে যাত্রা বিলাতগমন স্থগিত রাখিলেন।

এতদিন ধীরে ধীরে সোফিয়া পত্রে আপন এই নবপন্থার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন; এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের

সহিত তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন বোম্বাই প্রদেশে বাস করিবার পর কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতা হইতে এই পত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

## ক্যাথলিক পাদ্রীদিগের হুকুমনামা জারি।

যদিও তিনি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া আত্ম-সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন কিন্তু স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট, পরধর্ম্মদ্বেষী রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণ তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের উপকারিতা বুঝিয়া তাঁহাকে যথোচিত সাহায্য দানে উৎসাহিত করা দূরে থাকুক, কার্য্যের লক্ষ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, রোমান ক্যাথলিক সমাজ হইতে হুকুমনামা বাহির করিয়া রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদিগকে তাঁহার এই সোফিয়া-পত্র পাঠ করিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলেন।

এইরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রস্তাবিত ইসাপন্থী-নামক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সংগঠন কার্য্য হইতে বিরত হইলেন।

## টোয়েন্টিয়েথ-সেঞ্চুরী পত্র প্রকাশ।

উপাধ্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি শীঘ্র আর একটি মহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন। বেদান্তদর্শনের সহিত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া তিনি বেদান্তদর্শনের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। দেশবিদেশে এই বেদান্তশাস্ত্র প্রচার করিবার জন্য অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। আত্মমনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় টোয়েন্টিয়েথ-সেঞ্চুরী নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহাতে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ এবং পৃথক্‌ভাবে পঞ্চদশী নামক বেদান্ত-গ্রন্থের একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বেদান্তদর্শনের সাহায্যে তিনি হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি

হৃদয়ে অনুভব করিলেন যে, হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্ম্মের অর্থাৎ হিন্দুসমাজতত্ত্বের মূল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি নানা বর্ণভেদ এবং ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদি নানা আশ্রমভেদ থাকিলেও এ সকল ভেদ, ব্যবহারিক ভেদমাত্র; পারমার্থিক দৃষ্টিতে কোনও প্রভেদ নাই। যেহেতু সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমই সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরম-পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সকলের মূলাধার এবং তিনিই সকলের পরমগতি। এ সকলই সেই এক মহাসত্যে নিহিত। এই ভেদাভেদের মূলে সেই একই মহামিলন বিদ্যমান।

এইরূপে ক্রমশঃ যতই হিন্দুর দর্শন ও সমাজতত্ত্বের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি মত ও বিশ্বাস শুষ্ক পত্রের ন্যায় হৃদয় হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বর্ণ ধর্ম্ম, হিন্দুর জ্ঞান, হিন্দুর ধ্যান, হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর শিক্ষা—এ সকলই জগতের সমক্ষে যেন এক মহৎ আদর্শ শিক্ষার বিষয় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হিন্দুর যাহা কিছু সকলই তাঁহার নিকট পরম পূজ্য হইয়া দাঁড়াইল। এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও বঙ্গদর্শন-নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন।

হিন্দুর মুখ্য-আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে বশ করিয়া নিষ্কামত্ব হিন্দুর পরম সাধন। হিন্দু প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ভাল বাসে বটে, কিন্তু একেবারে মজিয়া আত্মহারা হয় না। হিন্দুর কার্য্যকলাপের মধ্যে হিন্দুর ধ্যান ধারণার মধ্যে সেই এক অদ্বৈত জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সেই একের ভিতর এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কেবল হিন্দুর চক্ষেই পড়িয়া থাকে। কেবল হিন্দুই এই অদ্বৈতের অন্তর্গত অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে, ও ভাবরসে ভরপূর হইয়া মাতিয়া রহিয়াছে। হিন্দুর এই অমিতজ্ঞানের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই। ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া

ফেল' দেখিতে পাইবে, সকলের মধ্যে সেই একই প্রকাশ। শত খুটিনাটি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেল, দেখিবে—মূলে সেই একই সাম্য বিদ্যমান। হিন্দু ভিন্ন অদ্বৈতের এই মধুর ও মঙ্গল ভাব আর কে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে!

## আশা-বাণী শ্রবণ।

যে ভারত এককালে জগতের শিরোভূষণ হইয়াছিল, ইহার শীলতা সভ্যতা জগতের চরম আদর্শ হইয়াছিল, আজ সেই ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভারত কি এই ভাবেই রহিয়া যাইবে? ভারত কি এ মোহনিদ্রা হইতে একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া অতীত গৌরবের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না? আর কি কখন ভারতীয় সভ্যতা জগতের সমক্ষে আপন মহিমায় আদরণীয়া হইতে পারিবে না? উপাধ্যায় আপন হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন; তাঁহার হৃদয় দেশের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই তিনি অতি সহজেই আপন অন্তরে ভগবৎপ্রেরিত আশাবাণী শ্রবণ করিলেন। তাঁহার বিশাল হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারত যদি পুনরায় আপন পূর্ব্বগৌরব সকল আদরের সহিত গ্রহণ করে তাহা হইলে ইহা অবশ্যম্ভাবী। বহুদিনের পরাধীনতায় ভারত একেবারে নির্জ্জীব হইয়া জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতবাসী আপনাদিগকে নিতান্ত হীন ও অকিঞ্চন ভাবিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষালব্ধ ধনে ধনী হইবে এই আশায় শত পদাঘাত সহ্য করিতেছে।

ভারত জ্ঞানবলে চিরবিশ্ববিজয়ী। কিন্তু কি যাদুমন্ত্রে এরূপ হত-চেতন হইয়া রহিয়াছে! ইংরেজি বিদ্যা শিখিয়া, ইংরেজি চালচলন

অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের দাসত্ব করিয়া, একেবারে জাতিভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে! একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে! এক সময় মুসলমানের বিদ্যায়, মুসলমানের চালচলনে অভ্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এরূপ জাতিভ্রষ্ট বা ধর্ম্মভ্রষ্ট কখন হয় নাই। তখন ধর্ম্মভয় ছিল, সমাজ-শাসনের কঠোরতা ছিল। কিন্তু এখন ইংরেজি বিদ্যার প্রভাবে সে ধর্ম্মভয় হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়াছে, সে সমাজ-শাসনের বাঁধ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন ইংরেজি বিদ্যার মহিমায় অন্তরে ও সমাজ মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভুত্ব।

যে যাদুমন্ত্রে ইহারা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে—সে যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় কি না? ইহাদের অন্তরে আত্মমর্য্যাদা ও আত্ম-নির্ভরের ভাব একবার জাগাইয়া দেওয়া যায় কি না? যদি ভারত-বাসী একবার এই মোহনিদ্রা হইতে চেতনা-লাভ করে, তাহা হইলে পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করিবে। আবার আপন ধর্ম্ম ও আপন সভ্যতাকে জগতের মধ্যে মহীয়সী করিয়া তুলিবে।

তিনি দিবারাত্র এই সকল বিষয় অনুধ্যান করিতেন, তাই শক্তি মাতৃরূপিণী হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। মর্ম্মে মর্ম্মে সে ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল। সে আহ্বানে মর্ম্ম-যন্ত্র মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া-ছিল। তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি ঐ দৈববাণী শুনিয়াছি। চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আমি ঐ মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি।"

## আশ্রমগঠন-কল্পনা।

এই সকল বিষয় অনুভব করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, যাহারা এরূপ যাদুমন্ত্রে একবার আত্মহারা হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় আপন পথে ফিরাইয়া আনা অতীব সুকঠিন। তবে কোমলমতি

বালকদিগের হৃদয়ে যাহাতে এ ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্য সর্ব্বপ্রথমে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিরূপে বালকদিগের মধ্যে শিক্ষাগুণে ক্রমশঃ আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব উন্মেষিত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহাতে বালকদিগকে প্রাচীন আদর্শে শিক্ষা দিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

## বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগদান।

জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শ ও এই নব আশা উপাধ্যায়ের হৃদয়কে যেমন উদ্বেলিত করিতেছিল, আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল তারা রবীন্দ্রনাথের এবং বঙ্গের আরও অনেক সুকৃতি সন্তানের হৃদয়ে এই ভাব জাগিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজাদি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সমভাবের আকর্ষণপ্রভাবে উভয়ের একরূপ মিলন হইল। তিনিও তাঁহার সিন্ধ্-দেশবাসী এক শিষ্যের সহিত সেখানে যাইয়া যোগদান করিলেন। প্রাচীন আদর্শে বালকদিগকে শিক্ষাদান করিতে যত্নবান হইলেন।

কিছুদিন সেখানে প্রাচীন আদর্শে বালকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে যাহাতে এই রূপ আশ্রমের বহুল প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

## সারস্বত আয়তন প্রতিষ্ঠা।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেই কলিকাতায় 'সারস্বত আয়তন' নামে এইরূপ আর একটি ক্ষুদ্রায়তন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। আয়তনটি স্থাপন করিলেন বটে কিন্তু ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতনস্বরূপ

কিছুমাত্র গ্রহণ করিবার নিয়ম থাকিল না। এমন কি, অনেকগুলি দরিদ্র বালককে আহার পোষাকপরিচ্ছদ পুস্তকাদি দ্বারা ভরণপোষণও করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—বেতন লইয়া বিদ্যাদান, ইংরেজের ব্যবসা-বুদ্ধিতেই খাটিয়া থাকে। আমরা হিন্দু, আমাদের দ্বারা বিদ্যা মূল্য লইয়া বিক্রয়, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। তবে অবস্থা অনুসারে স্বইচ্ছায় গুরুদক্ষিণা বলিয়া যে যাহা দিয়া সন্তুষ্ট হইবে, তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। বেতন লইয়া বিদ্যাদান করিলে গুরুশিষ্যের মধ্যে যে এক উচ্চভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্থান পাইতে পায় না। শিক্ষক শিষ্যকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া বিদ্যাদান করিবেন, শিষ্য ও শিক্ষককে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিবে।

আয়তনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এই বলিতেন, প্রাচীন আদর্শে শিক্ষাদান এইটিই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিবে। তবে ইংরেজের বাহ্য চাক্-চিক্যময়ী, গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী বিদ্যাও ইহার মধ্যে স্থান পাইবে। কারণ, সময়-অনুযায়ী সকলদিক বজায় রাখিয়া বালক গঠন করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন ভাব অবলম্বন করিয়া যদি শিক্ষাদান করা যায়, তাহা হইলে তাহারা বিদেশীর সমকক্ষ হইয়া তাহাদের সহিত বুঝা-পড়া করিতে পারিবে না। ইংরেজি বিদ্যা যে আর্যজ্ঞানের পরিচারিকা, এই সংস্কার আয়তনের বালকদিগের মনে—হাতে কলমে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। বাল্যকাল হইতে হিন্দুত্ব প্রধান ও ইংরেজী গৌণ, এই ভাব বালকদিগের মনে প্রবেশ করাইয়া দিলে আত্মবিস্মৃতি ঘুচিয়া যাইবে ও আত্মমর্য্যাদা ফিরিয়া আসিবে। গোলামি দুর করিবার ইহাই এক প্রশস্ত উপায়।

তিনি নিজে কপর্দ্দক-হীন। কিন্তু হৃদয়ের বল এতই অধিক যে, আপনি কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী হইয়াও এই গুরুভার আপন স্কন্ধে আরোপ করিলেন। আয়তনের ব্যয়বহনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আয়তনটি এই ভাবেই চলিতে লাগিল।

## বিলাত-যাত্রার সূচনা।

কিছুদিন পরে কয়েকদিনের জন্য বোলপুরে রবীন্দ্র বাবুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিদর্শনে গমন করিলেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় হাবড়া ষ্টেশনে শুনিলেন—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র কে যেন তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ শেলাঘাত করিল। দৌড়িয়া ভাগীরথী-তীরস্থ বেলুড় মঠে চলিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, সকলই নীরব নিস্তব্ধ। বন্ধুবান্ধবগণ সজল নয়নে মৃতদেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। স্বামীজির জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী তাঁহার মনে একে একে উদয় হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বিবেকানন্দ ত চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার কাজ কেমন করিয়া চলিবে। একবার ভাবিলেন, কেন—তাঁহার ত অনেক উপযুক্ত বিদ্বান্ গুরুভাই আছেন, তাঁহারাই চালাইবেন। কিন্তু পরক্ষণে যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয়ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। কে যেন অন্তরে আসিয়া এই কথা বলিয়া মর্ম্মে আঘাত করিল। একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। বিলাত-যাইবেন সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিলেন।

## কে স্বামী বিবেকানন্দ!

স্বামীজির সম্বন্ধে একস্থানে বলিয়াছিলেন—স্বামীজি, আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি—বন-ভোজন করিয়াছি, গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে তোমার

প্রাণে সিংহবল আছে তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয়পর্ব্বত-ভরা ব্যথা আছে।

আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তোমার অনুষ্ঠিত ব্রতের সমাধা সহজে ত হইবে না। কত বাধা বিঘ্ন জয় করিতে হইবে—কত ব্রতবিদ্বেষী নিশাচর সংহার করিতে হইবে, তবে ত উহার সিদ্ধি হইবে। এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি, অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি, তোমার সিংহবলের কথা ভাবি, তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি। অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে।

তিনি আরও একস্থানে বলিয়াছিলেন, আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ষ্টেশানে স্থির করিলাম, বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগর পারে লইয়া যায়, সে বড় সোজা লোক নয়।

## সাতাইশ টাকা অবলম্বনে বিলাত-যাত্রা।

এইবার তাঁহার হৃদয়ে বিলাত যাইয়া হিন্দুর বেদান্তদর্শন প্রচার করিবার ইচ্ছা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। তিনি আয়তনের ভার তাঁহার সিন্ধুদেশবাসী শিষ্যের উপর অর্পণ করিয়া, কেবলমাত্র সাতাইশ টাকা অবলম্বন করিয়া কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইলেন। মাদ্রাজে আসিলেন। মাদ্রাজে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিলেন। পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই রওয়ানা হইলেন।

## তৃতীয় খণ্ড।

### বিলাত-যাত্রা ও বিলাত-প্রবাস।

#### অর্ণবপোত আরোহণ।

বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসী। ইঁহার পোষাক পরিচ্ছদ বা বোঁচ্‌কা বুঁচ্‌কির আড়ম্বর কিছুই নাই। সঙ্গে কেবলমাত্র পাথেয় গায়ে একখানি বনাত, হাতে একখানি কম্বল। বিলাতে দারুণ শীত। বন্ধুবান্ধবেরা একটা মোটা গরম কাপড়ের আলখাল্লা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া সেইটা সঙ্গে লইলেন।

বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করে, প্লেগ হইয়াছে কিনা; আর সব বোঁচকা বুঁচ্‌কি কলের মধ্যে ফেলিয়া এক রকম ঔষধ দিয়া ধুইয়া দেয়। ইঁহার জিনিষ পত্র দেখিতে আসিল। কিন্তু কিছুই নাই দেখিয়া ডাক্তার একবারে অবাক হইয়া গেলেন। একটা ব্যাগ বা একটা পুঁটলি পর্য্যন্তও নাই। একটু এদিক ওদিক দেখিয়া শেষে একখানা পাশ দিয়াছিলেন। সহযাত্রীদিগের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি পুলিষের গুঁতা খুব চলিতে লাগিল। সকলে জিনিষ পত্তর লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু ইনি একেবারে লাট সাহেবের মত গিয়া জাহাজে উঠিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবরে বোম্বাই ছাড়িলেন।

জাহাজে উঠিয়া ভোজনের ব্যবস্থা কিরূপ করিবেন এই ভাবিতে লাগিলেন। মাছ মাংস অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং তাহাতে আর রুচি হইবে না। আবার সাহেবেরা তরকারি চর্ব্বি দিয়া রাঁধে

সুতরাং তাহাতেও যে সুবিধা হইবে এরূপ স্থির করিতে পারিলেন না। জাহাজ ছাড়িবার সময় অত্যন্ত গোলমাল; ছাড়িয়া দিলে দেখিলেন যে, কতকগুলি সিন্ধুদেশবাসী হিন্দু সওদাগর জাহাজে উঠিয়াছে। কেহ মল্‌টা, কেহ জিব্রলটার, কেহ টিউনিস যাইতেছে। সিন্ধীরা সর্ব্বত্র ব্যবসায় করিতে যায়। ইহারা জাতিতে বণিক্, কিন্তু মাংস ও মদিরা খায়। সমুদ্রপারে যাইলে ইহারা জাতিচ্যুত হয় না। ইনি সিন্ধুদেশে অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে দুই একজন ইঁহাকে জানিত। এই সূত্রে ইহাদের সহিত বেশ আলাপ হইয়া গেল। খুব খাতির। খুব যত্ন। ইহাদের সঙ্গে রাঁধুনি ও চাকর আছে। তাহারা খালাসিদের চুল্লীতে পাক করিয়া থাকে। আর আহারের কষ্ট রহিল না। সকাল বেলা চা ও হাতগড়া রুটি, মধ্যাহ্নে ভাত, ডাল, তরকারি, অপরাহ্ণে চা ও রাত্রিতে রুটি তরকারি। বেশ আমোদ প্রমোদে দিন কাটিতে লাগিল। সমস্ত দিন তাস পাশা ও সঙ্গীত চলে।

## বুয়র সেনাপতির সহিত পরিচয়।

জাহাজে তিন জন বুয়র আছে। তাহারা বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল; মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন সেনাপতি। তিনি বেশ ইংরেজী জানেন। তাঁহার সহিত বেশ আলাপ হইয়া গেল। তিনি বুয়র যুদ্ধের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। ইনি তাহার অনেকটা পড়িয়া ফেলিলেন। যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহার নিকট শ্রবণ করিলেন। ইঁহার সহিত একটি ছোট তামার লোটা আছে। সেনাপতি মহাশয়ের সেইটির উপর খুব নজর পড়িয়াছে। লোটাটি তাঁহাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলেন। তিনি খুব খুসি হইলেন। কিন্তু লোটা ছাড়িয়া বড় দুর্দ্দশা হইতে লাগিল।

বোম্বাই হইতে এডেন পর্য্যন্ত সমুদ্র কিছু বিক্ষুব্ধ ছিল। উহাতে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। এডেনে আসিয়া সব সারিয়া গেল।

এডেনে খুব গরম। কিন্তু যত জাহাজ উত্তরে চলিতে লাগিল, তত ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল। এখন ইঁহার শরীর বেশ ভাল আছে। অনেক রাত্রি অবধি জাহাজের ছাদে বসিয়া বসিয়া সমুদ্রের বাহার দেখেন। অল্পে অল্পে জাহাজ সুয়েজের খালে প্রবেশ করিল। খালের প্রারম্ভে সুয়েজ বন্দর—আর শেষে সৈয়দ বন্দর। জাহাজ সৈয়দ বন্দর ছাড়াইয়া ভূমধ্য-সাগরে আসিয়া পড়িল। আবার রাত্রিতে বাহিরে বসিয়া ঠাণ্ডা লাগাইয়া কোমরে খুব ব্যথা ধরিল। কতকটা উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িলেন। সৈদয় বন্দর হইতে তিন দিন কেবল অনন্ত জলরাশি। এইবার সিসিলি দ্বীপ দেখা দিল।

জাহাজখানি এক ইতালীয় কোম্পানীর। ইহার গম্যস্থান জেনোয়া সহর। ১লা নভেম্বর জাহাজ নেপল্‌স সহরে আসিয়া পৌঁছিল। ইঁহার টিকিট জেনোয়া অবধি ছিল। নেপল্‌সে আসিয়া শুনিলেন, এখান হইতে রোম (Rome) রেলে চারি ঘণ্টার রাস্তা। রোম দেখিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইল। জাহাজ হইতে নামিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত কোমরে ব্যথা হইয়াছে—অতি কষ্টে ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাকগাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ি রাত্রি ৯টার সময় রোমে পৌঁছিবে শুনিয়া কিছু ভাবিত হইলেন। বিদেশ বিভূঁই, রাত্রিকালে অনেক অসুবিধা হইতে পারে।

## য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রথম পরিচয়।

গাড়ি খুব বেগে চলিয়াছে। আগ্নেয়পর্ব্বত বিষুবিয়স অতি নিকটে। ইহার তলদেশে বড় বড় বসতি। রাস্তার দুই দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সুন্দর সুন্দর গ্রাম। বাহিরে প্রকৃতির এই সকল শোভা দেখিতে

দেখিতে চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার গাড়ির ভিতরে প্রকৃতির লীলা দেখিতে লাগিলেন। গাড়িতে এক যুবক ও এক যুবতী উঠিয়াছে। এই প্রণয়িযুগলের হাবভাব ব্যবহার দেখিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন! যুবক মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া যুবতীর মুখ মুছাইয়া দিতেছে। পাছে কয়লার কালিমা লাগিয়া সোণার অঙ্গ কালী হইয়া যায়। কখনও বা সুরা ঢালিয়া উভয়ে পান করিতেছে। আর কত যে কথা, কত যে ভঙ্গিমা তাহা বর্ণনাতীত। গাড়িভরা ভদ্রলোক। তাহাদের এরূপ আচরণ দেখিয়া কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। এটা যেন সচরাচর হইয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইঁহার প্রাণটি যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। কারণ ইঁহার মনে ধারণা হইল যে, এ নারীটি বারাঙ্গনা নহে—কুলাঙ্গনা। আপন দেশের ছবি মনে উদয় হইল—কোথায় বঙ্গের লজ্জানম্রা, অবগুণ্ঠনবতী, কল্যাণময়ী কুলবধূ; আর কোথায় ঐশ্বর্য্যমদমত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী বিলাসিনী গরবিণীমূর্ত্তি। চক্ষের সম্মুখে যেন স্বর্গনরক প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন।

## ইতালীয় যোদ্ধার সহিত পরিচয়।

এইরূপ অন্তঃ-প্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতির মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন, এমন সময় দুইটি ইতালীয় ভদ্রলোক গাড়িতে উঠিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন কিছু ইংরেজি জানেন। তিনি এক যোদ্ধা। তাঁহার সহিত একটি খোদিত লাঠি আছে। তিনি যত যুদ্ধ করিয়াছেন, সব উহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। ইঁহার সহিত কথা আরম্ভ হইল। উপাধ্যায়, ইতালী দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা ও রাজনীতির বিষয় কিছু কিছু জানেন। পেলিকো (Pallico) ও কবি প্লুতার্কের জীবন-কাহিনী তাঁহার নিকট কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতালী দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু কিছু

উত্থাপন করিলেন। শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত কম্বল-মাত্র-সম্বল বাঙ্গালি সন্ন্যাসীর মুখে তাঁহারা এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইতালী-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও পক্ষপাতিতা দেখিয়া দুই জনেই খুব আপ্যায়িত হইলেন। তাঁহারা রোমনিবাসী নহেন। তাঁহাদের বড় ইচ্ছা যে, ইনি তাঁহাদের দেশে যান। যাহা হউক, ইঁহার আর কিছু ভাবিতে হইল না। তাঁহারা ইঁহাকে এক হোটেলে লইয়া গিয়া বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। খরচপত্র এক পয়সাও লাগিল না; তাঁহারাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

## রোম সহর ও দেবালয় দর্শন।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া রোম সহর দেখিতে বাহির হইলেন। জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতালীর স্বাভাবিক শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, আর কোমরের ব্যথাও বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রাম গাড়ী চাপিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলেন। বাড়ি ঘর দোকান পশার সকলই যেন ছবির ন্যায় চিত্রিত রহিয়াছে। রোমনগর সাতটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। কোথাও বা ফুলের দোকানে মন মাতাইয়া দিতেছে। কোথাও বা ফোয়ারা দিয়া অবিরত স্বচ্ছ জলধারা নির্গত হইয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছে। কোথাও বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও মনোহর প্রস্তরমূর্ত্তিসকল রোমের পুরাতন কীর্ত্তি সকল জাগাইয়া রাখিয়াছে। এইরূপে সহর দেখিতে দেখিতে বরাবর চলিয়াছেন, এমন সময় ট্রামের চালক বলিল যে, ট্রাম আর যাইবে না। ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িলেন। নামিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড গির্জ্জা (দেবালয়)। দলে দলে নরনারী, বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র, ভিতরে যাইতেছে ও বাহির হইয়া আসিতেছে। এই দেবালয়টি এত বড় যে, ইহার মধ্যে ও প্রাঙ্গণে ষাট হাজার লোক ধরে। দেখিলে বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা নিজ হস্তে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনিও

দেবালয় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মণিমুক্তাপ্রবালাদি নাই, কিন্তু দেবালয়টি রজতশুভ্র মর্ম্মরের হাস্যকৌমুদীতে যেন বিধৌত হইয়া বিরাজ করিতেছে। চারিদিকে শত শত সাধু সাধ্বী মহাজনের মূর্ত্তি ও চিত্র স্থানটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। জগৎপ্রসিদ্ধ দৈবশক্তিসম্পন্ন চিত্রকর রাফেলের দ্বারা চিত্রিত মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্ত্তি (Madona) দর্শন করিয়া অত্যন্ত মোহিত হইলেন। মাতা মেরী যিশুকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মানা। চিত্রকর মায়ের মুখে অপূর্ব্ব করুণা ঢালিয়া দিয়াছেন। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে বলে যে, মা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র অকালে নিহত হইবে। তাই সুতস্পর্শজনিত আনন্দ, বিচ্ছেদবিষাদে সংমিশ্রিত। এরূপ করুণরসমিশ্রিত মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্ত্তি অতি বিরল।

অদ্য ক্যাথলিকদিগের শ্রাদ্ধপর্ব্ব। ক্যাথলিকেরা মৃত স্বজনের আত্মার কল্যাণের জন্য যজন, মন্ত্রপাঠ ও দান করিয়া থাকেন। পুরোহিত যজমানের হইয়া যজন ও মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সেই জন্য অদ্য দেবালয়ে এত লোকসমাগম। সকলেই নানাবিধ নয়নমনোহর পরিচ্ছদে সুশোভিত। লাতিন ভাষায় গম্ভীর স্বরে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ হইতেছে। বেদীগৃহ সকল ধূপধুনায় আমোদিত। ক্যাথলিকদিগের আচারপদ্ধতি অনেকটা হিন্দুদের মত।

রোমের দেবালয় দেখিবার পর কোমরের ব্যথা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতি কষ্টে পোপের চ্যাম্বারলেনের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু পোপ এখন বৈষয়িক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যাপৃত; অন্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারিবেন না, এইরূপ জ্ঞাত হইলেন। সুতরাং দেশে ফিরিবার সময় পুনরায় রোমনগর হইয়া ফিরিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

কোমরের ব্যথায় একেবারে চলচ্ছক্তিহীন। ট্রামে করিয়া ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এখন বেলা চারিটা। গাড়ী রাত্রি নয়টার সময় ছাড়িবে। সৌভাগ্যক্রমে এক ইণ্টারপ্রিটার (Inter-preter) আসিয়া জুটিল। সে খুব খাতির যত্ন করিয়া টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চাপাইয়া দিল। একেবারে লণ্ডনের টিকিট। গাড়ী সারারাত্রি চলিয়া পর দিন বেলা নয়টার সময় তুরীন (Turin) নগরে আসিল। গাড়ি আল্‌পস্‌ পর্ব্বতের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিল; ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গিরি সঙ্কট ও গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া অতি বেগে ধাবিত হইল। দুই ধারের মনোহর দৃশ্য সকল দেখিতে দেখিতে ফ্রান্সে আসিয়া পড়িলেন; রাত্রি এগারটার সময় পারিস নগরে পৌঁছিলেন। পর দিন বেলা নয়টার সময় গাড়ি। একটি হোটেলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রাতে সহর দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে, সেই জন্য আর সুবিধা হইল না। নয়টার সময় গাড়িতে উঠিলেন। বেলা বারটার সময় সমুদ্র-বন্দরে পৌঁছিলেন। জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ছাড়িয়া পুনরায় গাড়িতে উঠিলেন। এইবার লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখন সন্ধ্যা। রাত্রি এই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। ৫ই নভেম্বর অক্সফোর্ডে পৌঁছিলেন।

## অক্সফোর্ড।

এখানে ২৩টি কালেজ আছে। কালেজগুলি বহু পুরাতন। দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রেরা আসিয়া এখানে শিক্ষালাভ করে। সহরটি অতি সুন্দর। সহরটির তিন দিক দুইটি নদীদ্বারা বেষ্টিত। নদী দুইটি ৮।১০ হাত চওড়া হইবে। স্রোত অতি মৃদু, জল সুনির্ম্মল। নগরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৃণাচ্ছাদিত মাঠ আছে। মাঠের অপর পারে শ্যামল তরুলতা সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট পাহাড়। পুরাকাল

হইতে এইস্থানে বিলাতী সন্ন্যাসীদের বড় বড় মঠ ছিল। সেই সকল মঠের সহিত ছাত্রদিগের জন্য কালেজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধনবান্ ভক্তেরা ছাত্রদিগের আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দিত এবং ভরণ পোষণের জন্য বিপুল অর্থ দান করিত। কিন্তু প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন ভয়ঙ্কর ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময় ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনেরী সন্ন্যাসীদিগকে দূর করিয়া দিয়া মঠ সকল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ও দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। কাজে কাজেই কালেজগুলি এখন সরকারি খাসে আসিয়াছে। এই মঠ-ভাঙ্গার পর আরও গুটিকয়েক কালেজ হইয়াছে। প্রত্যেক কালেজেই ছাত্রাবাস আছে।

এখানে "বডলিয়ান লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকাগার আছে। ইহাতে প্রায় পাঁচলক্ষ পুস্তক আছে।

## কার্ডিনেল ভনের সহিত সাক্ষাৎ।

এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম কার্ডিনেল ভনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার নিকট আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। তিনি অতীব সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে তাঁহার পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুমতি দিলেন। দুই একটি প্রবন্ধও বাহির হইল।

একটি গৃহস্থের বাটীতে বাসা লইলেন। অতি সামান্য ভাবেই রহিলেন। মাসিক বাসাভাড়া ও খাই খরচের জন্য ৬৩৲ টাকা দিতে হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

## অক্সফোর্ডে বক্তৃতা প্রদান।

হিন্দু-চিন্তা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ( Hindu thought and The Western Culture ) বিষয়ক এক বক্তৃতা করিলেন। এখানকার সংস্কৃত অধ্যাপক ( Boden Professor of Sanskrit ) এ-এ, মাগ্‌ডোন্যাল

এম-এ সভাপতি হইলেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব জজ ট্রিভিলিয়ান (Trevelyan) উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই, জীবনপথের জটিল সমস্যা ভঞ্জন করিতে য়ুরোপীয়েরা কেন হিন্দু-চিন্তা প্রণালীর সাহায্য না লয়। যুদ্ধের সময় ভারতের সৈনিক চাই। কিন্তু প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির যুদ্ধের সময় ভারতের দর্শন কেন না চাই?

হিন্দুজাতি কেমন করিয়া সমস্যা ভঞ্জন করে, তাহার দুই একটা নমুনা দেখাইলেন। আর বলিলেন, শুধু সুখ্যাতি করিলে হইবে না, হাতে কলমে করিয়া দেখিতে হইবে, তাহা হইলে সুফল ফলিবে। খুব হাত-তালি। লোকে আরও বক্তৃতা শুনিতে চায়।

বক্তৃতাটি বেশ জমিয়াছিল। ছেলে ছোক্‌রা ও অধ্যাপকমণ্ডলে বক্তৃতার বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। যাঁহারা সিভিলিয়ানী শিক্ষা দেন, তাঁহারাও দুই চারি জন খুব বন্ধু হইলেন।

পর পর আর তিনটি বক্তৃতা করিলেন। প্রথম—হিন্দুর আস্তিক্য-তত্ত্ব (Hindu Theism) দ্বিতীয়—হিন্দুর নৈতিকতত্ত্ব (Hindu Ethics) তৃতীয়—হিন্দুর সমাজতত্ত্ব (Hindu Sociology)। বেলিয়াল কালেজের (Ballial) প্রধান অধ্যাপক ডাঃ কেয়ার্ড (Dr. Caird) সভাপতি হইলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই সুখ্যাতি করিলেন। নামটা বেশ চারিদিকে প্রচার হইয়াছে। ১৩ই ডিসেম্বর কালেজসকল বন্ধ হইল। এইবার সহর দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

## নজর বিভ্রাট।

প্রথম দিন রাস্তায় বাহির হইয়া মহা-বিপদ্‌। শ্মশ্রু গুম্ফমুণ্ডিত গৈরিক-ধারী নবঘনশ্যাম-কলেবর দীর্ঘায়তন কি একটা নূতন জীব মনে করিয়া চারিদিক হইতে ছেলেরা "Look Look" (দেখ দেখ) বলিয়া ইঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। পুরুষেরা গুম্ফের অগ্রভাগে কিছু হাস্যরেখা

প্রকাশ করিলেন। আর মেম সাহেবরা একটু শিহরিয়া উঠিয়া ঈষৎ দন্তরুচি-কৌমুদী বিস্তার করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, এইরূপ নজরের ভিড় হইতে নিস্তার লাভ করিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে দেখিতে বরাবর চলিলেন। চারিদিকে যেন ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। কি রাস্তাঘাট, কি ঘরদুয়ার, কি দোকানপশার, সকলই যেন ফিট্‌ফাট্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কত লোকজন, কত গাড়ীঘোড়া কিন্তু একটুও ঠেলাঠেলি নাই—একটুও চেঁচামেচি নাই!

## মুক্তপ্রকৃতির লীলা।

স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপার দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা চলিয়াছে—কেহ দৌড়িতেছে, কেহ হাসিতেছে, ভ্রূক্ষেপই নাই। আবার কত স্বামী-স্ত্রী হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। প্রায়ই দেখা যায়, কুমার-কুমারীরা বাহু বন্ধনে মিলিত হইয়া বিহার করিতেছে, কিম্বা আড়ালে আবডালে দাঁড়াইয়া বা বসিয়া রহিয়াছে। ভারতের অনেকস্থানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বটে, তাহারা বাহিরে যায়, বাজার হাট করে, ঘুরে ফিরে বেড়ায় কিন্তু এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই।

## শ্রমজীবীদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

এখানে একটি শ্রমজীবীদের বিদ্যালয় আছে। দেশ বিদেশ হইতে ছুতার, রাজমিস্ত্রী, কামার দরজী প্রভৃতি এখানে আসিয়া পড়াশুনা করে। তাহারা একদিন ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। ইনি তাহাদের সহিত খুব আলাপ করিলেন। আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের বড় মানুষের উপর অত্যন্ত রাগ। তাহারা সকলেই ভাল লোক, কিন্তু

দায়ে পড়িয়া বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে, তাহারা সামলাইয়া উঠিতে পারে না। ইনি আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা কিছু কিছু উল্লেখ করিয়া তাহাদের নিকট বলিলেন। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া কৌলিক কর্ম্মকে প্রাধান্য দিবার কথা শুনিয়া তাহার বিস্মিত হইল; কিন্তু ইহা যে শান্তিপ্রদ, তাহা বারবার স্বীকার করিল। তাহারা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্।

## মহাবিদ্যার আবির্ভাব।

এই বিদ্যার পীঠস্থানে কতকগুলি মহাবিদ্যা আছেন। তাঁহারা কেবল নূতন খুঁজিয়া বেড়ান। তাঁহারা ভারতবাসীদের সঙ্গে ভাব করিতে বড় ভালবাসেন। কেহ প্রাচীনা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ মধ্যম বয়স্কা, কেহ বা যুবতী। তাঁহাদের চালচলনে শীলতার কোন অভাব নাই। তাঁহারা দেশের সমাজ বা সমাজবন্ধন ভালবাসেন না। ছুট্‌কে বেরুতে পারিলেই বাঁচেন। তাঁহারা ইঁহাকে দুই একবার নিমন্ত্রণ করিলেন; কথাবার্ত্তা আলাপ-পরিচয় যথেষ্ট হইল, কিন্তু ইনি তাঁহাদের বড় একটা ঘেঁসপোট দিতে দিলেন না।

## 'মাইণ্ডের' সম্পাদক।

হিন্দু-ব্রহ্মজ্ঞান নামক একটি বক্তৃতা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া 'মাইণ্ডের' সম্পাদকের নিকট গমন করিলেন। 'মাইণ্ড' একখানি দার্শনিক পত্র। বড় বড় ইংরেজ দার্শনিক ইহাতে লিখিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় প্রথমে প্রবন্ধটি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। কেন না তাঁহার ঐ মাসিক পত্রের জন্য এক বৎসরের কাপি জমিয়া আছে। কিন্তু ইঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, খুব একটা ব্যাপার বটে, কিন্তু এখনকার কালে ও সব চক্ষুবুজুনি দর্শন

চলিবে না। কথা চলিতে লাগিল। কিছু আকৃষ্ট হইলেন। শেষ আর এক দিন কথাবার্ত্তার জন্য ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রবন্ধটি রাখিয়া আসিলেন। তার পর যে দিন যাইলেন, সে দিন তিনি বলিলেন— প্রবন্ধে নূতন কথা আছে ; যে রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বেদান্ত পাশ্চাত্যদর্শনের অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত ; আমি এ প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। প্রবন্ধে জীব ও জগৎ যে মিথ্যা ও মায়ার রাজ্যে যে কোন স্বাধীনতা নাই—তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর পাশ্চাত্য-দর্শনে যে মায়িক অলীকতার প্রতিবাদ আছে, তাহারও খণ্ডন করা হইয়াছে।

ইংরাজেরা অতি শীতকাতুরে। ইঁহার শীত-সহিষ্ণুতা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইঁহার যোগবল আছে। তা না হইলে এত শীতে কিছুমাত্র কাবু করিতে পারে না কেন ?

## নিউম্যানের বাসস্থান দর্শন।

এক দিন এক অধ্যাপক আসিয়া ইঁহাকে লইয়া গাড়ি করিয়া বাহির হইলেন। ইঁহার মাথায় এক মলিদার টুপি ও গায়ে পীতবর্ণের বনাত। রাস্তার লোকে হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। গোটাকতক ছোঁড়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার ইনি ফর্ ফর্ করিয়া ইংরেজী কথা কহিতেছেন দেখিয়া অনেক মেম সাহেব একেবারে অবাক্। এইরূপে কিছুক্ষণ পরে লিটল-মোর নামক এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে স্বর্গীয় নিউম্যান বাস করিতেন। তিনি একজন ধর্ম্মবীর। যে গৃহে তিনি বাস করিতেন, সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এখন এখানে আর একজন অধ্যাপক বাস করেন। গৃহমধ্যে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারই লিখিত এক ইংরেজি প্রবন্ধ মেজের উপর খোলা রহিয়াছে ও পাতায় পাতায় পেন্সিলের আলোচনা ঘনসন্নিবিষ্ট। প্রবন্ধে মায়ার

বিষয়ই লেখা আছে। অধ্যাপক আসিয়া ঐ সকল বিষয় উত্থাপন করিয়া ইঁহার সহিত মায়া-বাদ সম্বন্ধে আলাপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইঁহার এখন বেড়াইবার অত্যন্ত সখ হইয়াছে। তাই তাঁহাকে আর একদিন আসিবার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় হইলেন। ইনি বলিতেন—মায়া কথাটা শুনিলে ইংরেজ চমকিত ও স্তম্ভিত হয়। আমরা দীন হীন জাতি; আমাদের মরা বাঁচা শালগ্রামের শোয়া বসার মতন দুই সমান। জগৎকে মায়াময় মিথ্যা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি কিন্তু ইংরেজের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাই জগৎ মিথ্যা ইহা একেবারেই মিথ্যাকথা মনে হয়, অনেক মারপেঁচ কোরে বুঝাতে হয়। সহজে তারা ঘাড় পাতে না, কিন্তু অবশেষে ঘাড় পাতিতেই হইবে। আমাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহারা সম্রাট্ হইয়াছে। ঐ সাম্রাজ্য মায়ার ফাঁকি, আর কিছুই নয়—ঐ স্বীকার করিয়া একদিন তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের পদানত হইতে হইবে এবং জ্ঞানের জয় ও বলের পরাজয় ঘোষণা করিতে হইবে। বক্তৃতার বিষয় চারিদিকে বেশ একটু প্রচার হইল। বার্মিংহাম হইতে বেদান্তসম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন।

## অক্সফোর্ডের স্ত্রী-সভায় বক্তৃতা।

অক্সফোর্ডে স্ত্রীলোকদের এক সভা আছে। এই সভায় হিন্দুগৃহস্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। এক অধ্যাপকের ঘরণী বেশ বিদুষী, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। মেয়ের পাল সভায় উপস্থিত হইল। দু দশজন পুরুষও সভায় আসিল।

হিন্দুর ছোট ছোট মেয়েরা কি রকম পুণ্যিপুকুরের যমপুকুরের ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায়, তাহা বলিলেন। হিন্দু বিবাহের বিবরণ শুনিয়া সকলে অত্যন্ত খুসি হইল। ঢেলা ভাঙ্গানি, শয্যা-তোলানী, বাসর ঘর ইত্যাদিও বর্ণনা করিলেন। ছাদনাতলায় বর কাণমলা ও কিল খায়

শুনিয়া সকলে হাসিয়া অস্থির। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া মেয়েরা কি রকম কমিটি করে, শাশুড়ী কি ভাবে ক'নে বউকে সায়েস্তা করে, স্বামী-স্ত্রী, গুরুজনের সমক্ষে দেখাদেখি কথা কহিতে পারে না, তাহাও বুঝাইয়া বলিলেন। আর আমরা ভালবেসে বিবাহ করি তা নয়, বিবাহ ক'রে ভালবাসি, এ কথা বলিলেন। হিন্দু পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহ সম্ভোগের জন্য নয়। পিতামাতা ভাল কুল-শীল দেখিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন। চঞ্চলস্বভাব যুবকযুবতীর হস্তে পরিণয়ের গুরুভার অর্পিত হয় না। শেষ বলিলেন যে, আমরা তোমাদের মত জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিয়া বা জুতা বুরুষ করিয়া স্ত্রীলোকের সম্মান করি না। কিন্তু আসলে করি। আমার ভ্রাতৃবধূ যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সেই বিধবা ও তাহার পুত্রকন্যাকে আমার ভরণ পোষণ করিতে হয়। সেইরূপ বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয়দিগকে তাহাদের অশন বসন যোগাইতে হয়। স্ত্রীলোক আমাদের নিকট অবশ্য-প্রতিপাল্য। এখানে ভারত-প্রত্যাগত পাদরি ও জানানা লেডিদের মুখে ভারতের যে সকল নিন্দার কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, সে সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা; এই সকল বিষয় উত্থাপন করিয়া বেশ বুঝাইয়া দিলেন।

বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বলিলেন যে, পাদরি ও জানানা লেডিদের মুখে ভারতের নিন্দার কথা আর তাঁহারা গ্রাহ্য করিবেন না। একজন সাহেবও বলিলেন যে, এইরূপ বক্তৃতা বিলাতের সহরে সহরে হওয়া উচিত।

## রূপের পূজা বা প্রতিকোপাসনা।

একটি বক্তৃতায় বলিলেন যে, ইংরেজের নিকট প্রকৃতি সম্ভোগের বস্তু বলিয়াই আদৃত হয়; তাই তাদের পক্ষে রূপের পূজা বা প্রতীক-উপাসনা অসম্ভব। হিন্দুসন্তান স্বরূপলাভের জন্য কি প্রকারে রূপের পূজা করে,

তাহা শুনিয়া ভাল ভাল লোকেরা বলিলেন যে, রূপের পূজাকে আর কখনও নিন্দা করিবেন না। রূপের পূজার ব্যখ্যা করিয়া বলিলেন—রূপের দুইটি ভাব—মধুর ও মঙ্গল। মাধুর্য্য ও কল্যাণের সমাবেশ-স্বরূপের ভূমানন্দ। কিন্তু আমরা প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া মধুরকে মঙ্গলভাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি ও ব্যবহার করি। যাহার আকর্ষণে মাদকতা জন্মে, ইন্দ্রিয় বিলোড়িত হয়—তাহাই মাধুর্য্য। সম্ভোগের আবর্ত্তে মাধুর্য্যই জীবকে টানিয়া আনে। মঙ্গল কিং স্বরূপ? আত্মদানই মঙ্গল। পূর্ণতা যখন উপচিত হইয়া অপরকে ভরপূর করে, বাসনাকে সমাহিত করে সম্ভোগের প্রমোদকে বিশুদ্ধানন্দে পরিণত করে তখনই শিব-স্বরূপের দর্শন হয়। সালঙ্কারা নবপরিণীতা বধূর চপলমাধুরী মুগ্ধ করে, প্রিয়জনকে অপর আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু ভূষণ-বিরহিতা আলুলায়িত-কেশা কল্যাণময়ী মাতা দান করিতেই ব্যস্ত—আত্মদান ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই। অল্পজলা স্রোতস্বতী কলকলরবে নাচিতে নাচিতে ধাবিত হয়—মধুরতা যেন দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত; আর তুষার-পরিপুষ্টা আপূর্য্যমাণা ভাগীরথী আত্মসলিলদানে কত শত প্রবাহকে পূর্ণ করিয়া মাতৃপদে বরণীয়া হইয়াছেন। অনেক ফলফুল তরুলতা আছে বটে কিন্তু কদলীবৃক্ষ মঙ্গলের পরিচায়ক। কোন অনুষ্ঠানে স্নেহরূপ রম্ভাতরুর অভাবে তথায় শতসহস্র নবমল্লিকার সদ্ভাব থাকিলেও—মঙ্গলের যেন অধিষ্ঠান হয় না। কেন—কদলীবৃক্ষের ন্যায় আত্মদ আর কে আছে? পর্ণ—ভোজনপাত্র, সার—আহার সামগ্রী, শঙ্ক—রজকের ব্যবহার্য্য। আর প্রাণ-বিসর্জ্জন-সমন্বিত ফলদান দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

যতদিন প্রবৃত্তি থাকিবে ততদিন রূপের সাধন করিতে হইবে; অনিত্য রূপকে নিত্যস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া গ্রহণ না করিলে প্রবৃত্তিপরায়ণ মানবের পক্ষে স্বরূপলাভ অসম্ভব। মাধুর্য্যশালী বস্তু প্রতীক হইতে পারে না, কেন না তাহা প্রবৃত্তিকে সম্ভোগমুখিনী করে। যাহা মহান্ মঙ্গলময়,

যাহা আত্মদান করে, তাহাই সেই শিবস্বরূপের প্রতিমা বলিয়া স্বীকৃত। গীতাশাস্ত্রে জ্যোতিষ্কের মধ্যে তপন—পাদপের মধ্যে অশ্বত্থ—গিরির মধ্যে হিমালয়—নদীর মধ্যে গঙ্গা—বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভূতিমান্ কল্যাণময় বস্তুই প্রতীক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যখন কোন ভক্ত অশ্বত্থের মূলে জলসেক করে, তখন ভূমার মঙ্গলভাবই পূজিত হয়। যখন কুলকামিনীরা পয়স্বিনী গাভীর পরিচর্য্যা করে, ভালে সিন্দূর লেপন করিয়া তাহাকে মাতৃপদে বরণ করে, তখন অনন্ত করুণাই উপাসিত হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যদেবকে বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত করেন তখন হিরণ্ময় পুরুষই স্তুত হন। অবিশেষকে জানিতে গেলে—বিশেষ বস্তুবিশেষ স্থানবিশেষ কালকে তাহার বিশেষ অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গঙ্গোত্রী পবিত্র তীর্থ, সাধারণ গ্রামে বা নগরে সে পবিত্রতা নাই। গ্রহণের কাল—অন্য কালের অপেক্ষা দান-পূজার অধিকতর উপযোগী। সাধুভক্তগণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের তিথি অপরাপর তিথি অপেক্ষা নিশ্চয়ই সম্মানার্হ। অশ্বত্থ অন্য বিটপীর অপেক্ষা পূজ্যতর। গঙ্গা মাতৃস্থানীয়া—যে সে নদী নহে। রূপকে এই প্রকার স্বরূপের বিগ্রহ বলিয়া উপাসনা করিতে হয়। রূপকে সাধন-সামগ্রী না করিলে প্রবৃত্তির তাড়না হইতে বাঁচা দায়।

ইংরেজেরা প্রকৃতির রূপকে ভালবাসে, কিন্তু রূপের সাধন জানে না। নব্য সভ্যতার শাস্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে পবিত্রতার বা মঙ্গলভাবের আরোপ নাই। প্রকৃতির মাধুরী লইয়া কত না গীত—কত না গাথা। কিন্তু যে সকল বস্তু আত্মদ ও কল্যাণময়, তাহার আদর নাই। ক্রোটন আর অর্কেরিয়া লইয়াই ব্যস্ত; অশ্বত্থ বা কদলী বা বিল্বতরুর কোন সম্মান নাই। প্রকৃতি কেবল সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে। তাহার মঙ্গলময়রূপ তিরস্কৃত হইয়াছে। আর এ দেশে সম্ভোগের ভাব অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে মঙ্গলভাব দেখা

সুকঠিন ব্যাপার। ছয় সাত মাস স্বভাব যেন একেবারে মৃতপ্রায়। তার পরে সৌন্দর্য্যে ফেটে পড়ে। এতদিন সংযমের পর যদি গোটাকতক দিন আমোদের সময় মাধুর্য্য-সম্ভোগ না করা যায়, তা হ'লে জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার রূপের পূজার ব্যাখ্যা শুনিয়া এক মস্ত অধ্যাপক পাদরি ইঁহাকে লিখিলেন যে, রূপসাধনের তত্ত্ব অতি গম্ভীর ও মনোহর। তাঁহারা অনেকে মনে করেন যে, যদি ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই হিন্দুভাব নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে জগতের ঘোর অনিষ্ট হইবে।

## হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বক্তৃতা।

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করিলেন। বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, বর্ণধর্ম্মই হিন্দুজাতিকে চিরজীবী করিয়াছে। কত জাতি লোপ পাইয়াছে কিন্তু হিন্দু এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু যেরূপ ঝড়-তুফান বিপ্লব সহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আর ইতিহাসে নাই। ইংরেজের একতা রাজনীতির উপর নির্ভর করে। শেষ বলিলেন, আগে দেখাও যে, রাজনৈতিক একতা, এত ঝড়তুফান সহিতে পারে, তবে আমাদের শিক্ষকতা করিতে আসিও। মিছামিছি বর্ণধর্ম্মের নিন্দা করিও না।

বক্তৃতার ফল এই হইল যে, অক্ষফোর্ডে হিন্দুদর্শনের যাহাতে শিক্ষা হয়, তাহার জন্য জনকয়েক অধ্যাপক এক কমিটি করিতে প্রস্তুত হইলেন।

## ভূতুড়ের অধিষ্ঠান ও সিসেম ক্লাবে খানা।

কতকগুলা ভূতুড়ে বা ভূতের গল্পপ্রিয় লোক ইঁহাকে পাকড়াও করিল। তাহাদের ধারণা, হিন্দু হইলে পরের মন জানিতে পারা যায়; দেওয়ালের ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেতসিদ্ধ হওয়া যায়। ইহাদের কেবল ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের দিকে নজর—ভক্তি বা অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হইবে, এসকল কথা মাথায় যায় না। ইনিও বক্তৃতার উপর

বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আবার ইহাদের মধ্যে মেয়েমানুষই অধিকভাগ। ইহারাই তেড়ে ফুঁড়ে ভারতের দর্শনশাস্ত্র শিখিতে—শুধু শিখিতে নয়—আবার আচার্য্য হইতেও চায়। এই সকল মেয়ে ইঁহাকে ধরিল। লণ্ডনে এক সৌখীন লোকদের আড্ডায় ইঁহাকে লইয়া গিয়া খানা দিল। সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, সৌখীন মেয়েরা সন্ধ্যাবেলার পোষাক পরিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পোষাক—অর্দ্ধেক বুক ও হাত খোলা। এই দেখিয়াই ইহার আক্কেল গুড়ুম। কোন রকমে কপি ও আলু-সিদ্ধ কিছু ভক্ষণ করিয়া চম্পট দিলেন।

## কেম্ব্রিজ ত্রিনীতি-কালেজে বক্তৃতা।

অক্সফোর্ড হইতে কেম্‌ব্রিজে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। ত্রিনীতি-কালেজে তিনটি বক্তৃতা করিলেন। প্রথম—হিন্দুর নির্গুণ ব্রহ্ম। দ্বিতীয়—হিন্দুর ধর্ম্মনীতি। তৃতীয়—হিন্দুর ভক্তিতত্ব। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার মেটাগার্প ( Dr. Metaggarp ) সভাপতি হইলেন।

বক্তৃতাগুলি বেশ জমিয়াছিল। বক্তৃতার ফল এই হইল যে, অধ্যাপকেরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া যাইবে কি না।

এইবার তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, যদি এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া গলাবাজি করিবার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বক্তৃতাগুলি এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, অধ্যাপকগণ সংবাদ-পত্রে ঐ সকল বক্তৃতার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। পাঁচ সাত জন মিলিত হইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া যাহাতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শনের নূতন এক অধ্যাপক-পদের সৃষ্টি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

য়ুরোপের মধ্যে—বিশেষতঃ এরূপ উপযুক্ত স্থানে হিন্দুদর্শনের চর্চ্চা আরম্ভ হইবে, এই আশায় ইহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু ইহার সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে। একজন উপযুক্ত হিন্দুপণ্ডিত তিন বৎসরের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। নয় হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিতে হইবে। এই নয়হাজার টাকা অধ্যাপকের বেতনস্বরূপ—বার্ষিক তিন হাজার টাকা করিয়া তিন বৎসর দেওয়া হইবে। কিন্তু এই টাকা কোথা হইতে পাইবেন? বিধাতার মুখপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এখানে খরচপত্রের জন্য সময় সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এখানকার দস্তুর, বক্তৃতার জন্য টিকিট বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু ইনি টিকিট করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন না। আপনি হিন্দু। হিন্দুর বিদ্যাদানই চিরন্তন ধর্ম্ম। শত কষ্ট সহ্য করিয়াও সেইটি বজায় রাখিলেন।

হিন্দুর সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। পুনরায় অক্সফোর্ড দার্শনিক সভা হইতে নির্গুণব্রহ্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন।

## ষ্টেড সাহেবের আতিথ্য।

একদিন সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেড সাহেবের ( Mr. Stead ) অতিথি হইলেন। তাঁহার আপিসে একটি সভা হইল। সেই সভায় ইনি বক্তৃতা করিলেন। ষ্টেড সাহেবের সহিত আরও অনেক গল্পগাছা হইল। তিনি কেম্ব্রিজের কমিটীর কথা ইতঃপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। অত্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলেন।

অর্থ ও অধ্যাপক স্থির করিবার জন্য ভারত প্রত্যাগমন করিবেন মনে করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই রওয়ানা হইলেন।

বিলাতে অবস্থানকালে বঙ্গবাসীপত্রে তিনি যে সকল পত্র ছাপাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালার বহু অগ্রণী সাহিত্যসেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও গুণে মুগ্ধ হন। শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ তাঁহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

---

# চতুর্থ খণ্ড।

## কর্ম্মজীবন।

### কেম্ব্রিজে অধ্যাপক-প্রেরণ-কল্পে বিঘ্ন উৎপাদন।

ভারত প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই অর্থের একরূপ সংস্থান করিলেন। এইবার ইংরেজি জানা একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সকলে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতে লাগিল। অনেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে এ কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত করিলেন। আবার অনেকে বোম্বাই সহরের ভাণ্ডারকার মহোদয়কে নির্ব্বাচিত করিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের একান্ত অভিলাষ, একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এ কার্য্যের ভার লন কিন্তু শেষ ব্রজেন্দ্র বাবুকেই মনস্থ করিয়া বিলাতের কেম্ব্রিজ-কমিটিতে পত্র লিখিলেন। কেম্ব্রিজ-কমিটি রোমের পোপের নিকট হইতে ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনুমতি পাইবার জন্য জন্য পত্র লিখিলেন।

পোপ, ব্রজেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু ইতঃপূর্ব্বে ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপর তীক্ষবাণ প্রয়োগ করিয়া সংবাদপত্রে কিছু সমালোচনা করিয়াছিলেন; বোধ হয়, সেই কারণেই পোপ তাঁহার অধ্যাপনায় স্বীকৃত হইলেন না। তখনও উপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্র বাবুকে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক হইতে নানারূপ বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। একদল বিধিমত বিপক্ষতাচরণ করিয়া উপাধ্যায় মহাশয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া নিজেরাই এ কার্য্যে মাতব্বরী করিতে লাগিল। এবং নানাপ্রকারে এ কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দেখিল, যদি উপাধ্যায় ইংলণ্ডে এই কার্য্যের পত্তন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের ইংলণ্ডে মুরুব্বীয়ানা ও সুখের বাসা ভাঙ্গিবে, আর চারিদিকে উপাধ্যায়েরই জয়জয়কার পড়িয়া যাইবে। এই বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া তাহারা এই মহৎ কার্য্যের বিনাশ সাধন করিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি এখন এ কার্য্য স্থগিত রাখিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দর্শনের অধ্যাপক নিয়োগ এখন কল্পনাতেই রহিয়া গেল।

তাঁহার এক বন্ধু এই বিষয় উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মশাই ব্যাপার কি? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—ব্যথা হ'ল আমার, আর ছেলে হ'ল ওদের!

## বিলাত যাইয়া বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্য।

বিলাত যাইয়া বেদান্ত প্রচার করিবার তাঁহার এক মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দেখিলেন, য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে প্রায়ই এই বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতেছে যে, শ্বেতাঙ্গজাতি মানবকুলশ্রেষ্ঠ। জগতের অন্যান্য জাতি কেবল তাহাদিগের দাসত্ব করিতেই জন্মিয়াছে। এই প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা যেন একটি আসু-

রিক ভাব। ইহা পৃথিবীতে অমঙ্গল আনিয়াছে ও আনিবে। এই ভাব যতই প্রবল হইবে, ভারতের পক্ষে ততই অনিষ্টকর হইবে। এই বিপদটি দূর করিবার জন্য তিনি এই উপায় স্থির করিলেন যে, যদি ইংরেজ বেদান্তের অদ্বৈতবিজ্ঞান শিক্ষা করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের নিজের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবে; আর তাহাদের এই সর্ব্বনেশে আসুরিক ভাব দূর হইবে। এইরূপে তাহাদেরও মঙ্গল এবং আমাদেরও মঙ্গল সাধিত হইবে।

যদি ভারত পুরাকালের ন্যায় আবার পৃথিবীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি য়ুরোপ হইতে ছাত্রসকল ভারতবর্ষে দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য পাঠ করিতে আইসে, তাহা হইলে ভারতের প্রতি পাশ্চাত্য জগতের শ্রদ্ধা হইবে ও ঐ আসুরিক ভাবের হ্রাস হইবে। ভারত যে এখনও জগতের গুরুস্থানীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে ভারতের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে; তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ, ভারতবাসীদিগকে কাউপার ও পোপ মুখস্থ করাইয়া সাহিত্য শিখাইতেছে ও মারটিনোর ব্যাখ্যা করিয়া দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দিতেছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে! এই আত্মবিস্মৃতি কিসে যায়! ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, আমাদের শাস্ত্র শিখিতে ইংরেজের যদি আগ্রহ হয়, তাহা হইলে ভারতের আত্মবিস্মৃতি দূর হইবে এবং ইংরেজেরও মঙ্গল হইবে। এই জন্যই বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, মোক্ষমুলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের প্রয়াসে ভারতের কিছু সম্মান বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সে সম্মান না হওয়া ভাল ছিল। কারণ ইংরেজের ধারণা জন্মিয়াছে যে, হিন্দুজাতি এক সময়ে বড় ছিল কিন্তু এখন মরিয়া গিয়াছে। কেবল তাহার ঠাটমাত্র বজায় আছে। আমরা এককালে বড় ছিলাম কিন্তু এখন সভ্যজগতের নিকট আমরা একটা কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছি, তিনি এই সংস্কার দূর

করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, হিন্দুজাতি এখনও জীয়ন্ত। সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি কালের প্রভাবে হিন্দু বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কত সভ্য জাতি ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি মরণকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। কত উৎপাত, কত শোষণ, কত বিপ্লব ভারতকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। অন্য দেশ ভারতের ন্যায় প্রপীড়িত ও দলিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ; তবুও হিন্দু জীবন্ত ও সতেজ। ইহার কারণ, বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈত জ্ঞান হিন্দুর অবলম্বন ও চিরসহায়। হিন্দুর যোগ-দর্শন স্মৃতি-সাহিত্য বিধিব্যবস্থা আচারব্যবহার সংস্কার অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট। অদ্বৈতমুখীন নিষ্কাম ধর্ম্মপালনে হিন্দু, রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার ধারণা ছিল, বিলাতে হিন্দুর দ্বারা হিন্দু-দর্শন অধ্যাপিত হইলে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘুচিতে পারে এবং ভারত যে, সকল জাতির গুরু, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ আরম্ভ হইবে।

তিনি এ সম্বন্ধে আর একটি উদ্দেশ্য বলিতেন যে, যাঁহারা আমাদের দেশে বিচারপতি—যেমন জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি—হইয়া আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ থাকেন। কিন্তু যদি বিচারপতি হইয়া আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচারব্যবহারগুলি কিছু জানা থাকে, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কতকটা মঙ্গলদায়ক হয়।

## ভারত ও য়ুরোপে, গুরুশিষ্যের মিলন-স্থল।

তিনি বলিতেন, য়ুরোপীয় য়ুরোপীয়ই থাকিবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট অদ্বৈত-নিবৃত্তির মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদের দেশীয় আচারব্যবহার, রাজনীতি ও সামাজিকতাকে সংযত ও নিয়মিত করিবে। 'ব্রাহ্মণ বস্তুত্বের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান, আর সেই কেন্দ্র কিরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া

অনন্ত বৃত্তাকারে ভেদবহুলতায় পরিণত হয়, ব্রাহ্মণ তাহা জানেন। তিনি সংসারের সকল ব্যবহার ও সকল সম্বন্ধকে একই কেন্দ্রের আবরণ সূত্রে বাঁধিয়াছেন। আর য়ুরোপীয়েরা নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গমন করে—কেন্দ্রাভিমুখে পরিধি হইতে পরিধিতে আরোহণ করে। যদি ব্রাহ্মণের শাসন তাহারা স্বীকার না করে, তাহা হইলে বৃত্তপরিধি হইতে কোন ব্যতিরিক্ত-দেশে কেন্দ্রবিমুখে চলিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণের শাসন মানিয়া চলে বলিয়াই হিন্দুজাতি অচল ও অটল। অবস্থার কত না পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু হিন্দুজাতি সেই একই নিবৃত্তির পথে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। হিন্দুর ধর্ম্ম দর্শন এবং সমাজনীতির প্রসর ও স্থায়িত্ব অতুলনীয়। ইহা সমগ্র হিন্দুস্থানকে পুরাকাল হইতে শাসন করিতেছে। আজও বিংশতি কোটি মানব, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেছে। তাহারা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে জ্ঞানে ও সভ্যতায় পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছে. কিন্তু য়ুরোপ কি পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক রাজবিপ্লবে উহার ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন হয়। জিগীষা, হিংসা, প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে য়ুরোপীয় সমাজ উৎপীড়িত। অর্থ লইয়া ধনী ও দরিদ্রের ঘোর শত্রুতা। য়ুরোপ যতদিন না ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, ততদিন তাহাকে পাশব-শক্তির সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আর এই গুরুশিষ্যের মিলন হইলে হিন্দুজাতিরও বিশেষ উপকার হইবে। অন্তর্মুখী নিবৃত্তির ও বহির্মুখী প্রবৃত্তির বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে ও গূঢ় অদ্বৈততত্ত্ব সাংসারিক ব্যাপারে নূতন ভাবের উপযোগিতা লাভ করিবে ও নূতন আকারে প্রসারিত হইবে।

এই সকল বিষয় বিশেষরূপ অনুভব করিয়া য়ুরোপে যাহাতে বেদান্ত ও দর্শনের রীতিমত আলোচনা হয়, তাহার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে আশা ও সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

বিফলতা ও নৈরাশ্যের মধ্য হইতেই হৃদয় গঠিত হইয়া থাকে।

উপাধ্যায়েরও ঠিক তাহাই হইল। যদিও তিনি দুইটি মহৎ কার্য্যেই বিফলমনোরথ হইলেন কিন্তু একেবারে উদ্যমহীন হইলেন না। বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে তিনি বেদান্তদর্শনের একান্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন। এই দর্শনের আলোকে হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উহার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

## পাদ্রীর হাতে গীতা ও তাহার প্রতিবাদ।

ফারকোহার নামক ( J. N. Farquahar, M.A. ) জনৈক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-প্রচারক গীতা ও গস্পেল নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। পুস্তকের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, হিন্দুত্বের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পাশ্চাত্যধর্ম্ম ও বিদ্যা যাহাতে এদেশে অবাধে প্রচলিত হয়, তাহারই বিশেষ পন্থাসকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। বহুদিন হইতে হিন্দুর অদ্বৈত জ্ঞান, আশ্রমধর্ম্ম ও প্রতীকোপাসনা প্রভৃতির নিন্দা ঈশাপন্থী-দিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই পুস্তকে ব্যক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের প্রাণ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণকে কোনরূপে সরাইয়া ফেলিতে পারিলে ইঁহাদের অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়। তাই ফারকোহার সাহেব শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা দ্বারা পুস্তকখানির কলেবর বেশ বর্দ্ধিত করিলেন। ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী একদল প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি ইতিহাসে ছিল না এইরূপ প্রমাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর আর একদল সূক্ষ্মদর্শী প্রচারক আসরে নামিয়া সুর ধরিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অতীব দুশ্চরিত্র ও লম্পট। এইবার ইঁহার গাহনার পালা পড়িয়াছে। ইনি হিন্দুর প্রতি অতীব সদয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী তাই একেবারে ঐরূপ যুক্তির অবতারণা না

করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন ও নিজগুণে প্রবৃত্তিপরায়ণ সাম্প্রদায়িক কলঙ্ক হইতে কৃষ্ণচন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া লইলেন। তবে মূলে আঘাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, বা গীতা তাঁহার শিক্ষা নহে এই বলিয়া ডঙ্কা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সাহেবের মত কৃষ্ণের অবতারত্ব গীতাকারের কল্পনাপ্রসূত ; গীতাকারের কল্পনা ভ্রমক্রমে কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব গীতায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যীশুখৃষ্টের জীবনেরই সম্যক্ পরিচয়। কৃষ্ণের সহিত গীতার কোন সম্পর্ক নাই। গীতাকার কৃষ্ণকে উপলক্ষ করিয়া খৃষ্টেরই কথা বলিয়াছেন। তিনি খৃষ্টকে জানিতেন না ( কারণ তখন খৃষ্ট ইঁহার মত পতিতোদ্ধার করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই ) তাই কল্পনারথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। গীতা যীশুসম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী। গীতার ভাব যীশুতে পূর্ণতালাভ করিয়াছে। *

যাহা হউক, ইঁহার গীতা-শাস্ত্রে এই অভিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, বালসুলভচপলতার সম্যক পরিচয়। যিনি বিংশকোটি হিন্দুসন্তানের উপাস্য তাঁহাকে অনৈতিহাসিক, লম্পট বা সামান্যব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে সাহস, বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়—খঞ্জের পর্ব্বতলঙ্ঘন ভিন্ন আর কিছুই নয়—বামনের সুধাংশু স্পর্শনের আশা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোন্ হিন্দুসন্তান গীতার নিষ্কাম নিবৃত্তিমুখীন জ্ঞানধর্ম্মোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া না থাকে ? কোন্ হিন্দুসন্তান সেই সাধুজনতারণ দুষ্কৃতদমন নবঘনশ্যাম মূর্ত্তিকে কবিকল্পনা-প্রসূত বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে ?

উপাধ্যায় মহাশয়, ফারকোহার সাহেবের হিন্দুধর্ম্মে এই পাণ্ডিত্য যে, বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের অকালপক্কতা ও অশেষ চাঞ্চল্যের পরিচয়, ইহা দেখাইয়া

" Rightly read, the Gita is a clear-tongued prophecy of Christ, and the hearts that bow down to the idea of Krishna are really seeking the incarnate son of God."—*Gita and Gospel—Ibid.*

Personality of Sri Krishna বিষয়ে এলবার্ট হলে একটি বক্তৃতা করিলেন। ফারকোহার সাহেব আপন বিশ্বস্ত দূতগণকে এখানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তিপূর্ণ বিচারের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, অবশেষে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিষণ্ণ বদনে প্রস্থান করিলেন। এই হইতেই ফারকোহার ও তাঁহার অনুচরদিগের হিন্দুধর্ম্মের উপর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িল। মেট্রোপলিটান কালেজের প্রফেসার এন, এন, ঘোষ মহোদয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনিও ফারকোহার সাহেবের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া মৃদুমধুর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এই বক্তৃতা বাঙ্গলা ভাষায় প্রবন্ধাকারে লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই নাম দিয়া পুনরায় সাহিত্য-সভায় রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে পণ্ডিতজনমণ্ডলী মধ্যে পাঠ করিলেন। পূর্ব্বস্থলী-অধিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সভাপতি হইলেন। সকলেই একবাক্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনায় সুখ্যাতি করিলেন। তাঁহার ভাষার লালিত্য ও মধুর ভাবসমূহের একত্র সমাবেশ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া সকলেই মোহিত হইলেন। পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় উপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রবন্ধের মধ্যে দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি বিষয়ের সমর্থন করিলেন—অপরটির সমালোচনা করিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করিয়া বলিলেন—চল আজ রাসকেলি দর্শন করিয়া কামদোষ হইতে মুক্ত হই। আকাশে শরৎশশীর রসময়ী পূর্ণিমা, পৃথিবীতে শ্যামশশীর নিবৃত্তিময় নীলিমা। শশিকলা, রূপলালসাকে জাগরিত করে—আর, কৃষ্ণকলা তাহাকে প্রশমিত করে। এই ভোগমধুর শারদ পূর্ণিমাতে শ্রীনিবাসের বেণুরব, বৃন্দাবনকে মাতাইয়া তুলিল। আত্মবিস্মৃত গোপীজন, বংশীধ্বনির অনুসরণ করিয়া

কৃষ্ণসন্নিধানে সমুপস্থিত। কৃষ্ণপুত্তলিকা আভীর-বালিকা সকল আবা আবা ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পরে করে করে মিলিত হইয়া মণ্ডলাকারে রাসনর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ণচন্দ্রের করস্পর্শে সাগর যেরূপ তরঙ্গায়িত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণকরস্পর্শে গোপীহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আজি কৌমুদীস্নাতা মধুরা প্রকৃতি ও কৃষ্ণ-মাধুরী-মুগ্ধা প্রকৃতিরূপিণী গোপললনা পুরুষপ্রধানে মিলিত হইল— প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয় হইল।

হে গোপীজনবল্লভ! তুমি ব্রতধারী কঠোর যতী নও, তুমি সাধনসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় নও। তুমি ঈশ্বরের অবতার। তোমাতে অবিদ্যা ও বিদ্যার সমন্বয় হইয়াছে। সগুণ ও নির্গুণের মিলন প্রকটিত হইয়াছে। ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত তোমার মধুরচ্ছবি, হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। তোমার কৈশোর-লীলা ভাবিলে মন উদাস হয়। প্রবৃত্তির পূর্ণ খেলা, অথচ কামচেষ্টা নাই। তোমার চরিত্র ভাবিতে ভাবিতে যেন নিষ্কাম হই। রাসমঞ্চে গোপললনাবল্লরী আশ্রয় করিয়া যে কৃষ্ণকুসুম ফুটিয়াছিল, তাহার আমোদে কামগন্ধ তিরোহিত হয়। যাঁহাদের প্রবৃত্তি-লতিকা নিবৃত্তিকুসুমে শোভিত হইয়াছে, তাঁহারাই পুণ্যময় রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন। হায়! প্রবৃত্তিপন্থী সাম্প্রদায়িকেরা এই হরিচন্দন-বিনিন্দিত কৃষ্ণকমলের কি কুৎসিত ছবি অঙ্কিত করিয়াছে! নির্ব্বাণের ভূমানন্দকে মদনোৎসবে পরিণত করিয়াছে।—

## পণ্ডিত সামাধ্যায়ীর সহিত মিলন।

মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় এই স্থানটির সমর্থন করিয়া আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—মার্জ্জিত-জ্ঞান-বুদ্ধিবিশিষ্ট সভ্যতা-ভিমানী এক নব্য সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলা

অতীব কুৎসিত বিলয়া প্রচার করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ইংরেজেরা —মা সরস্বতীর বরপুত্রগণ-বুদ্ধিপ্রাখর্য্যের আধিক্যবশতঃ এ বিষয়টি অতি ঘৃণার্হ বলিয়া প্রচার করেন এবং এই জন্যই নব্যসভ্যেরা ইহার সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ ভেদ করিতে না পারিয়াই ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে হইলে এ বিষয়টি বাদ রাখিলে কৃষ্ণলীলা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কৃষ্ণলীলা-গৌরবের পূর্ণানুভূতি হয় না। কিন্তু না বুঝিয়া এরূপ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্রে কালিমা আরোপ করিলে নিজেদেরই বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পায়।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপবালাগণের সহিত এই লীলা করিয়াছিলেন সে কেবল তাঁহার অসীম দয়াপ্রবণতা। তিনি পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। তিনি নির্লিপ্ত অথচ তিনি মানসবিগ্রহ, গোপীজনবল্লভ। তিনি রাসরসিক, মাধুরীবিলাসরসজ্ঞ অথচ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। যে সময় তিনি বস্ত্রহরণ-লীলা করিয়াছিলেন, তখন গোপললনাগণ কাত্যায়নীব্রত ধারণ করিয়াছিল। কাত্যায়নীব্রতের ফল, একমাস কাল সংযমী হইয়া কৃষ্ণভজনা করিলে মাসান্তে কৃষ্ণদর্শন হইয়া থাকে। গোপবালাগণ যখন এই ব্রত পালন করিতেছিল, তখন এই শ্যামসুন্দর গোপীবল্লভ তাহাদিগের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ লীলাচাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই একদিন গোপবালাগণ যখন বিবস্ত্রা হইয়া যমুনায় জলকেলি করিতেছিল, সেই অবসরে তিনি তাহাদিগের বস্ত্রহরণ করিলেন। জল-কেলির সাঙ্গ করিয়া যখন তাহারা কূলে উঠিয়া দেখে যে, যশোদাদুলাল তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছেন, বাঁশীরবে মন মাতাইয়া দিতেছেন, তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কর দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিয়া, কেহ কেহ জলমধ্যে অর্দ্ধনিমজ্জিত থাকিয়া বস্ত্র ভিক্ষা

করিতে লাগিল। কিন্তু কেহ লাজমান দূর করিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইল না।

কামকণিকার লেশমাত্রও হৃদয়ে জাগিলে কৃষ্ণলাভ হয় না। গোপবালাগণ কৃষ্ণকমলকে পাইতে চায়, কিন্তু কামনা-রহিত, নিষ্কাম হইতে পারে নাই, কাম তখন দূর হয় নাই তাই এত লজ্জা। প্রবৃত্তি তখনও জাগিতেছে, তাই এত অভিমান। কিন্তু নিবৃত্তিকুসুম বিনা কৃষ্ণপূজা হয় না; তাই অন্তর্যামী ভগবান তাহাদের প্রবৃত্তি দূর করিয়া নিষ্কাম করিবার জন্যই এই চাতুরী খেলিয়াছিলেন। লাজমান দূর করিয়া আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পারিয়াছে কি না, তাহারই এই পরীক্ষা।

কামনা থাকিতে কৃষ্ণলাভ হয় না। হৃদয় নিষ্কলঙ্ক কামরহিত হইলে লাজমানও থাকিতে পারে না। পঞ্চম বৎসরের উলঙ্গ বালিকা যখন পিতার সন্নিধানে গমন করে তখন তাহার লজ্জা নাই। কারণ তাহার হৃদয়ে কামকণিকার লেশমাত্রও স্পর্শ করে নাই। কিন্তু ষোড়শ বৎসরের যুবতী কন্যা বিবস্ত্রা হইয়া কখন পিতার সম্মুখে গমন করিতে পারে না। লজ্জা অনুভব করে। কারণ তাহার হৃদয়ে কামপ্রবৃত্তি জাগিয়াছে—তাই এত লজ্জা।

বস্ত্রহরণ আর কিছুই নয়—গোপবালাগণের কাত্যায়নী ব্রতনিষ্ঠার পরীক্ষা মাত্র।

ভগবানের এই ভাবে এই পরীক্ষা করিবার কারণ যে, গোপবালাগণ তাঁহাকে পাইতে চায় কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে তাঁহাকে এখনও যশোদানন্দন বলিয়া ধারণা আছে কিনা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহারা পরপুরুষজ্ঞানে তাঁহার সমীপে উলঙ্গ হইয়া আসিতে সমর্থ হইবে না। পরপুরুষের নিকট গমন করিলে ব্যভিচারিণী হইতে হইবে, এই ভাব হৃদয়ে জাগিবে। কিন্তু বাস্তবিক যদি তাঁহাকে ভগবান বলিয়া ধারণা

হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমীপে উলঙ্গ হইয়া আসিতে লজ্জা বোধ থাকিবে না। ভগবানের নিকট উলঙ্গ হইয়া আসিলে ব্যভিচারিণী হইতে হইবে, এ ভাবও হৃদয় মধ্যে স্থান পাইবে না। আর তাহা না হইলে, প্রাণমন সমর্পণ করিয়া আত্মহারা হইতে না পারিলে, কাত্যায়নী-ব্রত ধারণের ফলপ্রাপ্তিও সুদূরপরাহত।

সামাধ্যায়ী মহাশয় আর একটি বিষয়ের সমালোচনা করিয়া বলিলেন —উপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া বেদের আধুনিকতা প্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের খিলসূক্তে—'কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশ বাসুদেব নমোঽস্তুতে' এই উল্লেখ আছে বলিয়া ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাল নির্ণয় হইতে পারে না। বদ অনাদি অনন্ত। সুতরাং বেদের মধ্যের কৃষ্ণনাম উল্লেখ আছে বলিলেই যে বেদ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন এরূপ প্রমাণ হয় না। বাস্তবিক যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বতন মীমাংসাকার জৈমিনী এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ করিয়া আলোচনা করিতেন। বরং তিনি এ সম্বন্ধে ববরপ্রাবাহণিক প্রভৃতি রাজা ও দেশের নাম উল্লেখ দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সকল নামের ব্যুৎপত্তি আছে। সেই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই সকল শব্দে বায়ু প্রভৃতি দেবতাকে বুঝায়। বেদোক্ত পবিত্র শব্দ লইয়া রাজা ও দেশের নাম রাখা হইয়াছিল। বেদে যে কৃষ্ণ শব্দ বা বিষ্ণু শব্দ আছে তাহা বুৎপন্ন শব্দ। কৃষ্ণ—কৃষ্ণধাতু ণক্। কর্ষণ করেন সংসার ক্লেশকে যিনি তিনিই কৃষ্ণ। অর্থাৎ পরব্রহ্ম। এইরূপ বিষ্ ধাতু নুক্ বিষ্ণু। বিষ্ ধাতু ব্যাপ্ত হওয়া, অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন সেই ভগবান। হৃষীকেশ—হৃষীক, ইন্দ্রিয়গণের ঈশ অর্থাৎ কর্ত্তা। অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে যথানিয়মে প্রেরণ করেন।

সে কালের ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলেই আপনাপন পুত্রদিগকে এক একটি পবিত্র ভগবৎভাব প্রণোদিত নামের দ্বারা অভিহিত করিতে

বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেই আপনাদের মনোমত এই নাম বাছিয়া লইতেন। সুতরাং বাসুদেব নাম যে এইরূপে গৃহীত হয় নাই তাহার প্রমাণ কি? এইটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

আর ইহা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ করিবারও উপায় নাই। কারণ বেদের মধ্যে উপদেশছলে কল্পনা দ্বারা অনেক নূতন নামের সৃষ্টি করিয়া উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অনেকে সামাধ্যায়ী মহাশয়ের এই সমালোচনার বিপক্ষে কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় সামাধ্যায়ী মহাশয়ের এই যুক্তিটিরই সমর্থন করিলেন ও আপনার ভ্রম স্বীকার করিলেন।

এই খানেই তাঁহার মহত্বের পরিচয়। অনেকেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি আপন মহত্বগুণে আপনার ভ্রম সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন।

## সন্ধ্যাপত্র প্রকাশের সূচনা।

বহুদিবস আলোচনায় যতই তিনি হিন্দুদর্শন ও হিন্দুসমাজতত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই হিন্দুসমাজকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হিন্দুর যাহা কিছু তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। এক কথায় ভারতীয় সভ্যতা এখন তাঁহার পরমপূজ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কালের পীড়নে ভারত একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। অতীত কালে ভারত জগতের শিরোভূষণ এবং ভারতীয় সভ্যতা জগতের পরম আদরের বস্তু ছিল। আবার কি ভারত জাগিবে না? আবার কি ভারতীয় সভ্যতা জগতে আদরণীয়া হইবে না? কিরূপে সেই তেজ সেই জ্ঞান আপামর সাধরণে লাভ করিতে পারে তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পুনরায় আবার সেই সকল

জাগাইতে পারা যায় কি না তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন য়ুরোপীয় সভ্যতা য়ুরোপীয় ধ্যান জ্ঞান একেবারে বিদূরিত করিতে না পারিলে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া বৃথা। যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্তরে আত্মমর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরের ভাব জাগাইয়া দিলে আবার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে এবং ভারতীয় সভ্যতাকে আবার জগতে মহীয়সী করিয়া তুলিবে। আমরা হিন্দু। আমরা হিন্দু থাকিব। বেশভূষায় অশনে-বসনে সর্ব্বপ্রকারে হিন্দু থাকিব, এই জ্ঞান সকলের মধ্যে জাগিয়া উঠা চাই। হিন্দুকে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, এমন জাতি আজ পর্য্যন্ত জগতে জন্মলাভ করে নাই। হিন্দুর সমাজ-তত্ত্বের সমালোচনা করে, এমন সভ্যতাভিমানী জাতির এখনও অভ্যুত্থান হয় নাই। তবে যদি আমরা দর্শনশাস্ত্রে অগ্রসর হইতে চাই, তাহা হইলে প্রতীচ্য দর্শন শিরোধার্য্য করিব, ইহা নিশ্চিত। কিন্তু আদান করিতে গিয়া যেন বেদান্তভ্রষ্ট হইয়া না যাই। বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় চিরকালই থাকিবে। হিন্দু গ্রহণ করে সংযোগ করে কিন্তু নিজের প্রতিষ্ঠা বা ভিত্তি ছাড়ে না। এই একনিষ্ঠ উদারতা হিন্দুজাতির বিশেষগুণ। আজ হিন্দুরা সেই একনিষ্ঠা সেই উদারতা হারাইয়া তেজোহীন ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার-বিষয়ে আমাদের নিজের ভিত্তির উপর দাঁড়ান উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই সেই ভিত্তি। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে নষ্ট হইতে দিব না। ঐ সমস্ত য়ুরোপীয়প্রথা বর্ণধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলবতী হইবে।

এই সকল সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি অবিলম্বে সন্ধ্যা নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার স্তম্ভে স্তম্ভে একদিকে হিন্দুর জ্ঞানধর্ম্ম ও সভ্যতার গুণগরিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অপরদিকে ইংরেজ ভারতবাসীকে নির্জীব বিবেচনায় কিরূপে যাদুমন্ত্রে

ভুলাইয়া রাখিয়া ক্রমশঃ পদদলিত করিতেছে তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন।

## সন্ধ্যার অনুষ্ঠান পত্র।

সন্ধ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এই প্রকাশ করিলেন—দুঃসময় পড়িলে লোকে বলে, এই ত কলির সন্ধ্যা অর্থাৎ কালরাত্রির কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া সুপ্রভাত হইতে এখন অনেক বিলম্ব। কিন্তু কলির সন্ধ্যার একটি শাস্ত্রীয় অর্থ আছে। বারশত বৎসর ধরিয়া কলির এক একটি সন্ধ্যা। এরূপ চারিটি সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে। এখন পঞ্চম সন্ধ্যা।

প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভবসাগরে জীব ডুবিয়া না মরে তাই তিনি গীতারূপ ভেলা প্রদান করিয়াছিলেন। যাহারা উহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁহারা তুফান কাটাইয়া কূল পায়; আর যাহারা উহাকে অগ্রাহ্য করে তাহারা হাবুডুবু খায়।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বৌদ্ধবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। আশ্রমধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয় সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়। তিনি বৌদ্ধদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়া ছিলেন।

চতুর্থ সন্ধ্যায় ম্লেচ্ছাধিকার। এইবার ভারতকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে। অনাচার ও অত্যাচারে দেশ বাঁচিয়া থাকিয়াও যেন মরিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম সন্ধ্যায় বোধ হয়, সুদশার পালা আসিতে পারে। কিন্তু পঞ্চমেরও দুইশত বৎসর চলিয়া গেল, তবু কোন সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। এখন উপায় কি? পুরাতন কথা ভাবিয়া দেখিলে উপায় কি, তাহা বোধ হয়, বুঝা যাইতে পারে।

আমরা একটি লম্বা রসিতে বাঁধা আছি। যতদূরই যাই না কেন, যতই ঘুরপাক খাই না কেন, খোঁটা ছাড়িবার যো নাই। সেই বেদবেদান্ত, সেই ব্রাহ্মণ, সেই বর্ণধর্ম্ম ছাড়া হিন্দুসন্তানের আর গতি নাই।

কলির পঞ্চম সন্ধ্যায় আমরা সন্ধ্যা নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে— কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা ম্লেচ্ছ। উপ-জীবিকার জন্য মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে, ম্লেচ্ছ হাব ভাব ধরিতে হইবে নহিলে উপায় নাই। এতে আর কি খাঁটি ধর্ম্ম থাকে! সমস্যা শক্ত বটে কিন্তু সিদ্ধান্তও আছে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ ও দেশ-বিদেশের বিবিধ সংবাদ লিখিত হইবে। বিদেশীয় কলকৌশল শিখিয়া কিরূপে ধনধান্যের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহারও মন্ত্রণা থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ— যাহা কর—হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও। সখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে। কিন্তু বিদেশী বিদ্যা শিখিলে বা পেটের দায়ে ধর্ম্মের ব্যাঘাত না করিয়া বহিরঙ্গ ব্যাপারের অল্প স্বল্প বদল করিলে ক্ষতি নাই। সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণের শিষ্য হইয়া জাতিমর্য্যাদা রক্ষা করিলে কোন দোষ স্পর্শ করিবে না। আমরা যতই নিজেকে ভুলি না কেন, আমাদের হৃদয়ে এক পুরাতন সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া বাজিতেছে।

পূজা পর্ব্ব, শিল্পসাহিত্য, সমাজনীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি সকল কথাই বলা হইবে কিন্তু সমুদয়ের ভিতরে ঐ এক সুরের খেল থাকিবে—বেদ, ব্রাহ্মণ ও বর্ণধর্ম্ম। এলতলা বেলতলা সেই বুড়ির পায়ের তলা। আমরা

যদি এই কথাটি বুঝিয়া একনিষ্ঠ হইতে পারি, নিশ্চয়ই ভগবানের কৃপা হইবে—অন্ধকার ঘুচিবে। নাস্তি গতিরন্যথা।

এই পত্রিকায় কোন নূতন কথা বলিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখিব না। আমাদের অগ্রজদিগের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কেবল নূতন আকারে প্রকাশ করিব। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

এই সকল বিষয়ে ভূষিত হইয়া সন্ধ্যা জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন সন্ধ্যার গুণগরিমা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল।

## বঙ্গ বিভাগ।

এইবার লাট কর্জ্জন কর্ত্তৃক রাজবিধিরূপ নির্ম্মম অস্ত্রাঘাতে বঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হইল। জাতীয় জীবনরূপী সুপ্ত সিংহ এই নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে জাগরিত হইয়া উঠিল। বহু দিবস নিদ্রার পর আলস্য ত্যাগ করিয়া 'বন্দে মাতরম্' ভৈরব গর্জ্জনে চারিদিক নিনাদিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া 'স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন' ঘোষণা করিল। এই পবিত্র গভীর গর্জ্জন হিমালয় হইতে কুমারিকা, পঞ্চনদ হইতে প্রাক্-জ্যোতিষের গিরিরাজি, আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত করিয়া ভারতের আবালবৃদ্ধ সকলের অন্তরে প্রবেশ করিল। চারিদিকে যেন কোথা হইতে এক সাড়া পড়িয়া গেল। কে যেন হৃদয়ে আসিয়া ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া ভারতবাসীকে ঐ পবিত্র মন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। সকলেই ঐ মন্ত্রে মাতোয়ারা হইয়া পড়িল। বনমালীর বংশীরবে গোপীগণ যেমন আকুল পাগলপারা হইয়া ছুটিত, কি জানি কাহার প্রেরণায় সকলেই সেইরূপ ঐ এক লক্ষ্যে আপন কর্ত্তব্যপথে ছুটিল। কে যেন হিমালয়শৃঙ্গে বসিয়া, কল্লোলিনীর তরঙ্গে মিশিয়া, নয়ন-মনোহর বঙ্গের শ্যামল-শস্যক্ষেত্রে পবন হিল্লোলে ঢলিয়া ঢলিয়া অতীতের পট উন্মুক্ত করিয়া দেখাইল। আর 'আয় বৎস আপন ঘরে ফিরে আয়' এই

বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। কাহার হৃদয়বীণা সে মধুর আহ্বানে ঝঙ্কারিত হয় নাই? কাহার নয়ন সে মোহন দৃশ্যে পরিতৃপ্ত হয় নাই?

উপাধ্যায়ের হৃদয়ও ঐ মধুর আহ্বানে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি এই সময় দেশমান্য বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র ও দেশগৌরব কর্ম্মযোগী অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। দেশ-মধ্যে যাহাতে 'স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন' এই ভাব আপামর সাধা-রণের মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহার জন্য স্থানে স্থানে বক্তৃতা ও সভা-সমিতিগঠন প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।

তিনি এখন দেখিলেন যে, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি যে সকল মহারথী কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত-জনের ভাষায় সুশিক্ষিত-জনগণকেই মাতাইতেছেন। কিন্তু যাহারা স্বল্পশিক্ষিত বা একেবারেই অশিক্ষিত তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহাদের মধ্যে এই ভাব জাগাইবার উপায় কি? এইরূপ জনসংখ্যাই ত জাতির শ্রেষ্ঠ ভাগ। ইহাদের সহিত মিশিয়া, ইহাদের প্রাণের কথা বাহির করিয়া, ইহাদেরই বোধগম্য ভাষায় না ডাকিলে, ইহাদিগের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না।

এই সকল অনুভব করিয়া তিনি শিক্ষিত জনগণকে জাগাইবার ভার বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতির হস্তে রাখিয়া স্বয়ং আপামর সাধারণের নিকট হইতে সাড়া পাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যার সেই আদিম গুরুগম্ভীর ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আপামর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী গ্রাম্যভাষা, রূপকথা, অপভাষা ও হেঁয়ালী প্রভৃতি দ্বারা এমন এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি করিলেন, যাহা বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব এবং অতুলনীয়। এমন এক ভাষায় সৃষ্টি করিলেন যাহা জনসাধারণের অতীব আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এই ভাষা পাঠ করিয়া দোকানের দোকানি-পশরী, জমীদারের সরকার, গোমস্তা, পাঠশালার গুরুশিষ্য, রাস্তার

মুটে, গাড়োয়ান সকলেই হাসিত কাঁদিত। জমিদার, গৃহস্থ, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, পুরনারী, বালকবালিকা, যুবকবৃদ্ধ সকলেই কখন আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িত, কখন বা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিত। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আজ সন্ধ্যায় কি লিখিয়াছে, এই জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া থাকিত।

## আকুল আহ্বান।

ভগবান্ তাঁহাকে যথার্থ প্রাণ দিয়াছেন। দেশবাসীর দুঃখে কি সমবেদনা! কি কাতর আহ্বান! কি আকুল আর্ত্তনাদ! বাস্তবিকই তাঁহার প্রাণ দেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এক স্থানে আপন প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের দশা কেন এমন হইল? কেন অহরহঃ ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে হা অন্ন—হা অন্ন রোল উঠিতেছে? কেন মহামারী মহারোগের প্রপীড়নে লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে? কেন শাসন-পদ্ধতির প্রতি এত বিদ্বেষ? অতএব এমন অসামঞ্জস্যে সমাজ স্থায়ী থাকিতে পারে না,—হয় আমরা আবার জাগিয়া উঠিব—নয় একেবারেই মরিব। কিন্তু যে দেশে শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন—সে দেশের আর্য্যজাতির বিনাশ নাই। চক্রনেমির আবর্ত্তনের ন্যায় কখনও বা উপরে উঠিব, কখনও বা নিম্নগামী হইব বটে,—পরন্তু মরিব না কেহ। আর্য্য-নাম—আর্য্য-গৌরব—আর্য্য-বিদ্যা—আর্য্য-সাধনা ও তপস্যা—সকলই বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু কাঁদিবার মানুষ চাই—ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উন্মাদ সাধক চাই—সর্ব্বত্যাগী তপস্বী চাই—ভগবৎ মণ্ডলী চাই—তবে ভগবানের শুভাগমন সম্ভব। যিনি যেমন, তাঁহার যোগ্য আমন্ত্রণকারী না হইলে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কেন? কোথায় তিনি—যিনি আহ্বান করিবেন—কোথায় তিনি,

যিনি হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া মায়ের চরণে রক্তজবার অঞ্জলি দিবেন—কোথায় তিনি, যিনি ভারতের দুঃখে উন্মত্ত হইয়া, নরনারীর পাপরুচিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া, ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেবতার দেবতা—রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ভয়ত্রাতা, ভগবানকে ভক্তিভরে বাঁধিয়া আনিবেন? কে বুঝাইবে যে, পাপভরে ধরিত্রী চঞ্চলা হইয়াছেন—আর যন্ত্রণা সহ্য হইতেছে না? কে ঘন ঘন ভূমিকম্পে, অনাবৃষ্টি, অতি-প্লাবনে, পর্ব্বতের অগ্ন্যুদ্গারে—মহামারীর পৈশাচ লীলায় দারিদ্র্যের অস্থিপেষণকারী বেদনায়, ঝঞ্ঝাবাতে, ধরার চাঞ্চল্য! বুঝিয়া ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে আর্ত্তস্বরে দয়াল প্রভুকে ডাকিবে? কে দ্বারে দ্বারে যাইয়া শুভবার্ত্তার ঘোষণা করিবে? কে বুঝাইবে, অগতির গতি ব্যতীত আমাদের অন্য গতি নাই? কে শুনাইবে, যিনি ইচ্ছাময়ী সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী, সর্ব্ববিদ্যা-বিনোদিনী, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বাণী, তিনি ইচ্ছা করিলে পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করাইতে পারেন, মূককে বাচাল করিতে পারেন, বামনকে চাঁদ ধরাইতে পারেন—বাঙালীকেও শূরবীরে—জগজ্জয়ী কর্ম্মিশ্রেষ্ঠে পরিণত করিতে পারেন। অন্নপূর্ণার রাজ্যে,—আনন্দকানন বারাণসীধামে এখনও ঘোর ত্রিযামা অতীত হইলে পাচক পাণ্ডা উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়া থাকে—'কে অভুক্ত, ক্ষুধার্ত্ত, ক্লিষ্ট, পিপাসার্ত্ত, পীড়িত, বিপন্ন আছ—মায়ের মন্দির-প্রাঙ্গণে আইস—তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইবে—জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা দূর না হইলে অন্নপূর্ণার ভোগ পূর্ণ হইবে না—সন্তান ক্ষুধার্ত্ত থাকিলে মা অনশনে দিন যাপন করিবেন।' এই আহ্বান যেমন দিনে দিনে প্রহরে প্রহরে কাশীধামে হইয়া থাকে—তেমনিই দিনে দিনে—পলে পলে—দণ্ডে দণ্ডে—জগ-জ্জাত্রীর আহ্বান হইতেছে—এস ভারতবাসী—আমার সন্তান, তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। এই মহৎ আহ্বান ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, প্লেগরোগীর আর্ত্তনাদে, শাসনদণ্ড-পীড়িত নিরীহ ভদ্রলোকের অপমান-

সূচক রোদনে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যিনি প্রকৃত আর্ত্ত তিনি এই বাণী শুনিবেন—তিনি ধরার ভার দূর করিবার কল্পে তপশ্চরণ গ্রহণ করিবেন। কারণ ধরার পাপভার দূর হইলে, আপনা-আপনিই স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—সে রাজ্যে নরনারায়ণ রাজা, সাধুসজ্জন প্রজা। কবে সে দিন হইবে?

## সন্ধ্যার ভাষায় রুচিবিকার।

অনেক সুরুচিসম্পন্ন বিদ্যাভিমানী তাঁহার সন্ধ্যার ভাষা ও রুচির নিন্দা করিতেন। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা পাইতে একটু বিলম্ব হইলে, তাঁহারাই অধিক অস্থির হইয়া উঠিতেন। সন্ধ্যার এই কঠোর কুরুচিকর ভাষা কেবল মাত্র য়ুরোপীয় যাদুমন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। আর ইহার দ্বারা যে জনসাধারণের অন্তরে এক নবীন ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি সমাজের অন্তরের ভাব—আপনার অন্তরের কথা, এই ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া সন্ধ্যার কলেবর অলঙ্কৃত করিতেন। সেই উপাধ্যায়—যিনি স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা-স্থলে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না. সেই উপাধ্যায়—যিনি দার্শনিক বক্তৃতা দ্বারা এককালে য়ুরোপের একটি বিদ্যাকেন্দ্রের পণ্ডিতদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তিনিই এই কঠোর কুরুচিকর ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি যদি এই রুচি ও এই ভাষার সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ভাবে সাড়া পড়িত কি না সন্দেহ।

অন্যায় ও অসত্য দেখিলে তিনি শত্রুমিত্র বিচার করিতেন না। অকপটচিত্তে ঘোষণা করিয়া তাহাদের অন্তঃস্থলে আঘাত করিতেন। এই অকপট সত্যবাদিতা ও তেজস্বিতার ফলে তিনি সমাজের মধ্যে

অনেকের নিকট—বিশেষতঃ ন্যায়নিষ্ঠ ইংরেজের চক্ষে—বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

তাঁহার এই সকল লিখন প্রণালীর মধ্যে এতটা নির্ভীকতা দেখিয়া প্রথম প্রথম সাধারণের মধ্যে অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি ইংরেজের একজন গুপ্তচর। তা না হইলে এতটা সাহস অন্যের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু যখন তিনি রাজদ্বারে রাজদ্রোহিরূপে অভিযুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিল। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, উপাধ্যায় যথার্থই প্রাণের ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া এ সকল মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার অকপট সত্যবাদিতা ও তেজস্বিতার পরিচয়-স্বরূপ নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

এক সময় তাঁহার এক বন্ধু কলিকাতার কোন এক পণ্ডিত, দেশ-মান্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া ধরিলেন। কিন্তু তিনি সেই বন্ধুকে এই বলিয়া উত্তর দিলেন যে, সম্পাদকের কার্য্য অতীব গুরুতর। ঐরূপ লোকের সহিত পরিচয় না থাকাই শ্রেয়ঃ। কারণ যদি কখন তাঁহার দোষ দেখি, তাহা হইলে সেই দোষ দেখাইয়া কিছু বলিতে সঙ্কোচ বোধ হইবে। তাঁহার সেই সরল সৌজন্য ও সেই অমায়িক মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে; আর কিছুই বলিতে সমর্থ হইব না।

## সন্ধ্যার বুলির কৈফিয়ৎ।

তিনি নিজেই এই সন্ধ্যার বুলির কৈফিয়ৎ দিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের বুলি কেন রূঢ়—কেন এত কড়া। যাঁহারা রুচি রুচি করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছে আমরা কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না। আমরা শাদাসিধে বুলিতে প্রাণের কথা লিখি—তাই সেটা সভ্য বাবুদের

ভাল লাগে না। তাঁহারা ছেঁদে বেঁধে কথা কহেন ও লিখেন। আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অত সভ্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারি না, তাই আমরা তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই। কিন্তু যাঁরা আমাদের বুলিটা কিছু কড়া বলিয়া নালিশ করেন তাঁহাদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমাদের স্বাভাবিক বুলি এত চোয়াড়ে নয়। তবে যখন রাগ দেখাতে হয়—হাঁক ডাক করিতে হয়—তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলে না। দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। এ সময় কি ভেল্‌সায় চলে? দেশে চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না—খোঁচা না দিলে শাণাইবে না। আর একটা উপমা দিই। পুকুরের নীচে পচা পাঁক জন্মিয়াছে। সেই জল খাইয়া লোকের জ্বর বিকার ধরিতেছে। ঐ পাঁক একবার ঘাঁটিয়া দিতে হইবে। এখন ঘাঁটিতে গেলেই জল ঘোলা হইবে। এই ঘোলানো দেখিয়া আমাদের সভ্য বাবুরা নাক সেঁটকান। কিন্তু মানুষ যে মরে—সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন সাড়া নাই—ব্যথা নাই। তাঁহারা বুঝেন না যে, ঘোলানোটার পরে যখন জল থিতুবে, তখন সরোবর নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর হইবে।

তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোভাবের দ্বারা উহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দূর করিয়া দিতে হইবে। আর রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাব্‌কাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। তাই বলিয়া কি সেই আফিমখোরের আর চাব্‌কানো ভাল লাগে। রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর হইলে সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে। তমঃতে সত্ত্ব বসে না, তাই রজঃ চাই। শেষে সত্ত্ব। সত্ত্বই বা শেষ কেন? তিন গুণের অতীত হওয়াই শেষ—নির্ব্বাণমুক্তি।

## একপক্ষপাতিত্বের সমালোচনা।

লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়া থাকে যে, উপাধ্যায় ইংরেজের দোষগুলিই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু গুণের বিষয় কিছু-মাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম। তিনি ইংরেজের কার্য্যকারিতা শক্তিকে, তিনি ইংরেজের দর্শন শাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার অনুকরণ করিবার জন্য আজীবন উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই অজাতশ্মশ্রু ইংরেজকে, ত্রিকালদর্শী অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-তুল্য ভারতবাসীকে তত্ত্বজ্ঞান ও সামাজিক শীলতা সভ্যতা শিক্ষাদানে প্রয়াস পাইতে উদ্যত দেখিয়া এতদুর নির্দ্দয় প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইংরেজের ঐ বাক্‌পটুতা ও যাদুমন্ত্রই যে ক্রমশঃ আমাদের দুর্দ্দশার মূল হইয়া দাঁড়াইতেছে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি ঐরূপ নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—যাহারা আমাদের দেশের একটি বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের তুল্য জীবন লাভ করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই, তাহারা আবার আমাদের দেশের সামাজিক শীলতা সভ্যতার সমালোচনা করে! এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার! এ কি কম ধৃষ্টতার পরিচয়!

অষ্টম শতাব্দীতে ভলটেয়ার যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মসমাজের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন কি তিনি বুঝেন নাই, যে, ঐ ধর্ম্ম ও ঐ ধর্ম্মসমাজের দ্বারা এককালে য়ুরোপে কি মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল? কিন্তু ঐ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ও ঐ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সমাজ যে য়ুরোপীয়গণের কণ্ঠের লৌহশৃঙ্খলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এই অনুভব করিয়াই তিনি ঐ ধর্ম্ম ও ঐ ধর্ম্মসমাজের মোহজাল হইতে য়ুরোপীয়গণকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ নির্ম্মম প্রচণ্ড ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেইরূপ বাস্তবিক ইংরেজের মধ্যে কতটা সদ্‌গুণ ও মহত্ত্ব আছে এবং তাহার দ্বারা আমাদের কত-

টুকু উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা উপাধ্যায়ের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি কি বুঝিতেন না? আর দেশপ্রেমিক দেশভক্তদিগের সহিত তাঁহার যে বিরোধ বা বিরাগ, তাহাতে দ্বেষ বা হিংসার সংস্রব ছিল না। তাঁহার এই বিরাগ জ্ঞানীর বিরাগ। বাস্তবিক যাহাদের প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার লেশমাত্রও বৈরিভাব ছিল না। তিনি সরল ও নির্ভীকচিত্ত ছিলেন, তাই অন্তরের সকল কথা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতেন। এক কথায় দেশভক্তদিগের সহিত তাঁহার যে বিবাদ বিসম্বাদ, সে কেবল জ্ঞানীর মমতার পরিচায়ক মাত্র।

## ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে লোকাপবাদ।

লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ করিয়া থাকে যে তাঁহার মতি স্থির ছিল না। তিনি একবার ব্রাহ্ম, একবার খৃষ্টান, পুনরায় আবার হিন্দু হইয়াছিলেন। এখানে বক্তব্য এই যে, শিক্ষার সহিত মানসিক পরিণতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অস্বীকার করা চলে না এবং গতি বা পরিবর্ত্তনই জগতের জীবনের লক্ষণ; অপরিবর্ত্তন অনেকস্থলেই জড়তার নামান্তর মাত্র। বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাটের দিনে উদ্দাম ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা অসংযতভাবে বিকসিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য বা অভিনব বিষয় নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির এইরূপ বারবার মত পরিবর্ত্তন ইতিহাস পাঠে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ তিনিও যখন যেটিকে সত্য ও শান্তিপ্রদ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, অকপটচিত্তে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন সামাজিক সুখ্যাতি বা অখ্যাতির দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

বাল্যকাল হইতে অত্যধিক প্রতীচ্য অনুশীলনের ফলেই যে তাঁহার এইরূপ ধর্ম্মবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর তিনি আপনিই বলিতেন যে,ইংরেজি বিদ্যা আমাদের মাথা একেবারে খাইয়াছে। এখানে তাঁহার নিজের কথার দ্বারা নিজেরই অবস্থা প্রকাশিত হইতেছে।

এই সকল বুঝিয়াই পরে তিনি আপন অপকর্ম্ম স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি যে হিন্দু-সমাজের চক্ষে একটি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ঘটনায় তাঁহার আত্ম-মুখেই এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল।

পণ্ডিতবর মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় তাঁহার 'সারস্বত আয়তনে' আসিয়া যোগদান করিবার কিছু পরে, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত আদি-ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সামাধ্যায়ী মহাশয়ের বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনাদের সমাজের আচার্য্যের পদে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ধরিলেন। সামাধ্যায়ী মহাশয়, উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই বিষয়টি উত্থাপন করিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন—দেখুন, আপনি এখন অকলঙ্ক আছেন, হিন্দুসমাজে আপনার যথেষ্ট মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি আছে; আপনি যদি এখন আদিসমাজে যাইয়া আচার্য্য হন, তাহা হইলে হিন্দুদের আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তিটুকু আছে, তাহা হারাইবেন। আমি ঐ একদোষে হিন্দুসমাজের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত কত না নাস্তানাবুদ হইতেছি। কত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আপনাকে এ কাজে হাতে দিতে বলিতে পারি না।

## সন্ধ্যার আসর।

সন্ধ্যার ভেরী-নিনাদ বাজিয়া উঠিয়া—সুপ্ত জাতিকে জাগাইয়া তুলিল। সন্ধ্যা শত্রুর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার অবাধে সহ করিয়া

আপন উদ্দেশ্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপাধ্যায় মহাশয়, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি স্বনামধন্য সাহিত্যরথিগণ নানাবিধ যুক্তিমীমাংসাপূর্ণ প্রবন্ধাদি দ্বারা সন্ধ্যার কলেবর অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা দেশমধ্যে দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর হইতে ধনশালীর প্রাসাদতল পর্য্যন্ত সকল স্থান অধিকার করিল; সকলের একটি প্রিয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এমন দিনও অনেক গিয়াছে, যখন একপৃষ্ঠা মুদ্রিত সন্ধ্যার জন্য লোকে লালায়িত হইয়াছে। একপৃষ্ঠা মুদ্রিত করিয়া যোগাইবারও অবসর হয় নাই।

## সন্ধ্যাই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ।

স্বদেশীর যখন নাম গন্ধও ছিল না তখন সন্ধ্যার জন্ম। যাই মাত্র সন্ধ্যা আসরে নামিল, অমনি যেন কোথা হইতে স্বদেশীর হাওয়া চারিদিকে বহিতে লাগিল। বাঙ্গালির যেন মানইজ্জত আবার জাগিয়া উঠিল। এখন সন্ধ্যাই বাঙ্গালীর প্রাণের কথা খুলিয়া বলে। বাঙ্গালির একবার সন্ধ্যা না পড়িলে মনটা ফাঁকা ফাঁকা থাকিয়া যায়। এমন চব্য চুষ্য লেহ্য পেয়—ঝাল মিষ্টি টক ইত্যাদি ষড়রসের সমাবেশ আর কিসে থাকিবে? যাহার যাহাতে রুচি, সে সেইটিই ইহাতে পাইয়া থাকে, আর কোথাও ছুটিতে হয় না। বিশেষতঃ সন্ধ্যার এই স্বদেশী চিনির কড়াধাতের পাক, 'আবারখাব' (সন্দেশ) অতীব মুখরোচক। সন্ধ্যাই এখন বাঙ্গালির মানইজ্জত বজায় রাখিবার একটি প্রধান সহায় হইয়া উঠিল। যেখানে অবিচার অত্যাচার, সেইখানেই সন্ধ্যার তীব্র কটাক্ষ; অত্যাচার অবিচারে উৎপীড়িত হইলেই সকলে সন্ন্যাসীর সন্ধ্যার পর্ণকুটীরে আসিয়া শান্তিলাভ করে। বরণ কোম্পানীর কেরাণীগণ ধর্ম্মঘট করিলেন, সন্ধ্যা তাঁহাদের প্রাণের কথা খুলিয়া বলিল। দলে দলে সকলে আসিয়া মানইজ্জত বজায় রাখিবার জন্য যুক্তিপরামর্শ করিতে

লাগিলেন। ছাপাখানায় ধর্ম্মঘট হইল, সন্ধ্যা নিরীহ গরীব কম্পোজিটার-দিগের মনের কথা বাহির করিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল। দলে দলে কম্পোজিটারগণ আসিয়া সৎপরামর্শ চাহিতে লাগিল। রেলে ধর্ম্মঘট করিল, সন্ধ্যা রেলকর্ম্মচারীদিগের প্রাণের কথা প্রকাশ করিল। দলে দলে রেলকর্ম্মচারিগণ আসিতে লাগিল। কৃষ্ণনগর, নোয়াখালি, বরিশাল, ঢাকায় ছেলেরা স্বদেশীভাব গ্রহণ করিতে গিয়া সেখান হইতে তাড়া খাইয়া এই সন্ধ্যায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। সন্ধ্যা আফিসে এখন দিন রাত্রি সমভাবে লোকসমাগম। সন্ধ্যা আফিসে এখন দুই বেলা ন্যূন পক্ষে পঞ্চাশখানি পাতা পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা আফিস এখন বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ। সন্ধ্যা সন্ন্যাসীর এক পবিত্র যজ্ঞকুণ্ড; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, যুবক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই অবারিতদ্বার। সন্ধ্যা বাঙ্গালির আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার একটি প্রধান অবলম্বন। সন্ধ্যার পর্ণকুটীর, বাঙ্গালির হৃদয়ের জ্বালাযন্ত্রণা দূর করিবার একটি পবিত্র আশ্রম।

## সারস্বত আয়তন।

এখন উপাধ্যায় সন্ধ্যা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সারস্বত-আয়তনের উপর আর ততদূর লক্ষ্য রাখিবার অবসর থাকিল না। ইতঃপূর্ব্বে তিনি নিজেই বালকদিগকে শিক্ষাদান করিতেন, কিন্তু এখন নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সময়াভাব ঘটিল। উপযুক্ত অধ্যাপকগণের হস্তে এই ভার অর্পণ করিলেন। আর সুবিধামত এক একবার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

## গোঁড়া ক্যাথলিকগণের উপাধ্যায়ের সঙ্গ-ত্যাগ।

প্রথম প্রথম কোন কোন ক্যাথলিক তাঁহাকে এই আশ্রমের ব্যয় বহনের নিমিত্ত মাসিক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু পরে

যখন তাঁহাদের ধারণা হইল যে, উপাধ্যায় ক্রমশঃই হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন এবং এই আশ্রমের দ্বারা হিন্দুদিগের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মবিস্তারের কোন আশা নাই, পরন্তু আশ্রমে হিন্দুর পূজাপর্ব্বের (শ্রীপঞ্চমী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি) অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, তখন তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। তিনিও তাঁহাদের সাহায্য-প্রত্যাশা ত্যাগ করিলেন। এখন হিন্দুরা আসিয়া তাঁহার এই সকল অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে লাগিলেন। অনেকদিনের বন্ধু, অনেক গোঁড়া ক্যাথলিক এই কারণে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন। এমন কি, তাঁহার বহুদিনের অনুগত, আশ্রিত এবং তাঁহারই কর্তৃক খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত রেবাচাঁদ-জ্ঞানচাঁদ-মখিজানী (ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ) নামে সিন্ধুদেশবাসী এক প্রিয় ছাত্র তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিলেন, এবং পৃথক্‌ভাবে আর একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয় এই আশ্রমটির জন্য একবার বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে এই আশ্রমে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ধরিলেন। কিন্তু তাঁহারা অন্যান্য বিবিধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় উহাতে যোগদান করিতে স্বীকৃত হন না।

## সামাধ্যায়ী মহাশয়ের আয়তনের ভারগ্রহণ।

ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয়ের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি এই আয়তনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আনন্দিত হইলেন ও আয়তনে আসিয়া যোগদান করিলেন। সামাধ্যায়ী মহাশয় আয়তনের কতক ভার আপন স্কন্ধে লইয়া তাঁহার পরিশ্রমের কিছু লাঘব করিলেন। প্রাচীন আদর্শে এই আয়তনের ছাত্রসকল গঠিত হইতে লাগিল। সংস্কৃতই শিক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিল। ইংরেজি শিক্ষাও বেশ চলিতে লাগিল, তবে ইহা ঐ শিক্ষার

কার্য্যকারিণী সহচরীরূপে স্থান পাইল। পুরাকালে শিষ্য যেরূপ গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যালাভ করিত, এখানেও ঠিক তাহাই হইল। অধ্যাপকগণ ও অনেকছাত্র এই আয়তনেই বাস করেন। কয়েকজন ছাত্র বাটী হইতে আসা যাওয়া করে। বাটীতে থাকে বটে, কিন্তু নামে মাত্র। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই আয়তনেই থাকে। মধ্যে একবার বাটী যাইয়া আহার করিয়া আইসে। পাঠের সময় পাঠ ও অন্য সময় আপন গৃহের ন্যায় অবাধে খেলা ধূলা করে। অধ্যাপকগণের মধ্যে একজন না একজন সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া বালকদিগের তত্ত্বাবধান করেন। প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতে অধ্যাপকগণ ও ছাত্রবৃন্দ সকলে গঙ্গাস্নান ইত্যাদির দ্বারা আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন। আয়তনে পূজা পর্ব্বেরও অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী এবং শ্রীপঞ্চমী-পূজা উপলক্ষে বেশ ধূমধাম হইয়া থাকে। ছাত্রেরা আপন গৃহের মত আপনারা পরিশ্রম করিয়া বাটীঘর সাজায় ও আমোদ আহ্লাদ করে। আয়তনটি যদিও আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু মহৎ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া এইভাবে চলিতে লাগিল।

## স্বরাজপত্র প্রকাশ।

১৩১৩ সালের ২৩এ ফাল্গুন হইতে স্বরাজ নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র এই সন্ধ্যা হইতে প্রকাশিত হইল। কিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হয় এবং কি প্রকারে অতীত গৌরবের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়ে, ইহাতে তাহারই সদুপায় সকল আলোচিত হইতে লাগিল।

## করালীপত্র প্রকাশ।

কিছুদিন এই সন্ধ্যা হইতে করালী নামে আর একখানি অর্দ্ধসাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

## শিবাজী উৎসব।

১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি বিশেষ আড়ম্বরে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। পুনা হইতে তিলক, অমরাবতী হইতে খাপর্দ্দে ও নাগপুর হইতে ডাক্তার মুন্‌জি নিমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া এই উৎসব চলিল। জননীর সিংহবাহিনীমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহার পূজা, হোম, যাগ ইত্যাদি বৈদিক ক্রিয়াসকল, কথকতা, বক্তৃতা, শিল্পপ্রদর্শনী, নানাবিধ আমোদপ্রমোদ ও খাওয়া দাওয়ার যথেষ্ট ধূমধাম হইল।

মহারাষ্ট্র-কুলতিলক বীরাগ্রগণ্য ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পুণ্যনাম ও অতুলনীয় কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজ তাঁহার উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল।

## বঙ্কিমোৎসব।

তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়া বন্দেমাতরম্ মহামন্ত্রের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব উপলক্ষে কাঁটালপাড়ায় ( বঙ্কিমবাবুর আবাস-ভূমিতে ) ১৩১৪ সালের ৮ই বৈশাখ অতি ধূমধামের সহিত মাতৃপূজা ও মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

## সন্ধ্যায় প্রথম খানাতল্লাসী।

১৩১৪ সালের ২৮এ শ্রাবণ, 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়' ৩রা ভাদ্র, 'ছিদিসানের হুড়ুম দুড়ুম, ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম', ৬ই ভাদ্র, 'বোচ্‌কা সকল নিয়ে যাচ্চেন শ্রীবৃন্দাবন', এবং আরও কয়েক দিনের সন্ধ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধসকলে রাজদ্রোহিতার পরিচয় পাইয়া ১৩ই ভাদ্র প্রাতে পুলিশ সন্ধ্যা আফিসে খানাতল্লাসী করিলেন। তখন আফিসে ম্যানেজার সারদাচরণ সেন ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। পুলিষ ম্যানেজারকে সমন দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন।

আর দুইখানি সমন পুলিষের সঙ্গে থাকিল। ম্যানেজার অবিলম্বে জামিনে খালাস পাইলেন। ২৩এ ভাদ্র পুলিষকোর্টে বিচারের দিন স্থির থাকিল।

উপাধ্যায় মহাশয় শুনিলেন, তাঁহার ও প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাসের নামে আরও দুইখানি সমন বাহির হইয়াছে। ১৭ই ভাদ্র তিনি নিজেই পুলিষকে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য ম্যানেজার সারদাচরণকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। পুলিষ অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উভয়কে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া চলিলেন। সেখানে যাইয়া উভয়েই জামিনে খালাস পাইলেন।

## উপাধ্যায় এখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৈরিক বসনের উপর তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। যখন বিচার আরম্ভ হইল, তিনি বলিলেন—ছিঃ, ফিরিঙ্গির আদালতে গেরুয়া পরিয়া যাইব! আমাকে পৈতা গ্রন্থি করিয়া দাও, আমি যজ্ঞোপবীত পরিয়া শাদা কাপড়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রূপে ফিরিঙ্গির কাছে হাজির হইব। যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন।

## সন্ধ্যার দায়িত্ব স্বীকার।

বিচারের দিন উপস্থিত হইলে তিনি বিচারকের সম্মুখে সন্ধ্যার যাহা কিছু দায়িত্ব সকলই আপন স্কন্ধে লইলেন। আর বিচারককে বলিলেন যে, ভগবৎ-প্রেরণায় তিনি ভারতে-স্বরাজ-সংস্থাপন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি বিদেশীর নিকট কোনরূপ কৈফিয়ত দিবেন না। বিচার চলিতে লাগিল।

## প্রায়শ্চিত্ত।

২০এ আশ্বিন। ১৩১৪ সাল মহালয়ার দিন ভট্টপল্লিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে তিনি আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিলেন। তবে যে তিনি খৃষ্টীয়ধর্ম্মবিদ্বেষী হইলেন তাহা নহে—কারণ সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সেই এক। দেশের প্রকৃতি-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে মাত্র। হিন্দু অন্য কোন ধর্ম্মকে নিন্দা করে না।

তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্তের আর একটি কারণ তিনি সন্ন্যাসীর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু কখন বিধি-অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনি একবার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি নাই, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব, পরে বিধি-অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।

ভারতী সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার তাঁহার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। অভিলাষ কতকটা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—সম্পূর্ণ করিবার অবসর পান নাই।

ভারতী-সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত। শঙ্কর তাঁহার দশনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রদায়কে সমাজের মধ্যে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিবার অধিকার দিয়াছেন।

## রোগের কথা।

প্রথম যৌবনে বিষম আমাশয় রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া) রোগ হইয়াছিল। সেই রোগে তিনি চিরদিনই ভুগিতেন। আরোগ্যের নিমিত্ত কখন কোন ঔষধ ব্যবহারাদি করেন নাই। বিলাতে যাইয়া যখন বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন লণ্ডন সহরের বড় বড় ডাক্তার তাঁহার রোগ চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। তিনি তাঁহাদের কথায় উত্তর দেন—"এই বিদেশে আমি আছি। আমার ইচ্ছা নহে, আমি তোমাদের দেশে থাকিয়া অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকি। যদি দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে এ দেশে

আমার দেহ কেন মাটিতে মিশাইবে!" এই কথায় ডাক্তারগণ নিরস্ত হইয়াছিলেন। সেই রোগ ভোগ করিয়া তিনি পরে আট বৎসর কাল দেহ ধারণ করিতেছিলেন। তার পর সিডিসানের মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। তিনি আসামী হইলেন, কাঠগড়ায় তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। কয়েকদিন ক্রমাগত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাঁহার সে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার কৌঁসুলী আদালতকে বসিয়া একখানি চেয়ার দিবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঘৃণার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—ফিরিঙ্গীর কাছে ভিক্ষা! কখনই না। কিংস্‌ফোর্ড সাহেব যদি ভদ্রলোক হয়, তবে আমার ভদ্রতার মূল্য সে বুঝিবে, আর অযাচিতভাবেই আমাকে বসিবার আসন দিবে।

## অস্ত্র-চিকিৎসা।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাত দিন কাটিল। পূজার ছুটি আসিল। পুরাতন হার্ণিয়া বাড়িয়া উঠিল, অস্ত্রচিকিৎসা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। ডাক্তার মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র-প্রমুখ সহরের বড় বড় বাঙ্গালি অস্ত্রচিকিৎসকগণ তাঁহার ভার লইলেন। শেষে স্থির হইল, ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যাইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ হইবে। তাহাই হইল। শুশ্রূষার কোন ক্রটি থাকিল না। হাসপাতাল যেন একটি তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। দলে দলে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। ফল-ফুল-মিষ্টান্নে হাসপাতালকক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। অন্যান্য দরিদ্ররোগী তাঁহার বিতরিত বেদানা আঙ্গুর পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল। সকলেরই মনে আশা হইল, উপাধ্যায় সারিয়া উঠিবেন।

## ডাক্তারি সার্টিফিকেট।

বিচারের দিন উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় আসামী সারদাচরণ, প্রথম আসামী উপাধ্যায় মহাশয়ের হইয়া একখানি ডাক্তারের সার্টিফিকেট

আদালতে দাখিল করিলেন, আর বিচার কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিবার জন্য একখানি দরখাস্ত করিলেন গভর্ণমেণ্ট পক্ষের উকীল বিচার স্থগিত রাখিবার বিরুদ্ধে আদালতকে বলিলেন—কেবল মাত্র একখানি সামান্য সার্টিফিকেটে বিচার স্থগিত থাকিতে পারে না। যে ডাক্তার এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাঁহার আদালতে উপস্থিত হইয়া জানান উচিত ছিল যে, আসামী বাস্তবিক অসুস্থ, আদালতে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

বিচারক মহাশয় সম্মুখে ৯ই কার্ত্তিক দিন স্থির করিয়া, আদালত হইতে ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিলেন যে, আসামী কত দিনে আরোগ্যলাভ করিবে।

## সন্ধ্যার দ্বিতীয় খানাতল্লাসি।

৭ই কার্ত্তিক, পুলিশ পুনরায় সন্ধ্যা আফিসে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তাঁহারা কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যে প্রবন্ধগুলির উপর বিচার চলিতেছে, সেগুলির হস্তলিপি চাহিলেন। পরে খানাতল্লাসির হুকুমনামা দেখাইয়া খানাতল্লাসি আরম্ভ করিলেন। খানাতল্লাসী শেষ হইলে ম্যানেজার সারদাচরণকে তাঁহাদের সঙ্গে থানায় আসিতে বলিলেন। গাড়িতে উঠিয়া তাঁহারা সারদাচরণকে তাঁহার নামে একখানি গ্রেপ্তারি সমন দেখাইলেন। প্রিণ্টারকে তাহার বাটিতেই গ্রেপ্তার করা হইল। ২৫এ ও ২৭এ ভাদ্র সন্ধ্যায় প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধে, রাজদ্রোহিতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া পুনরায় দুই জনকেই গ্রেপ্তার করা হইল। পুলিশম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ম্যানেজার ও প্রিণ্টারের পক্ষ হইতে জামীনে খালাস দিবার জন্য প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু এবার জামীন অগ্রাহ্য হইল। উভয়ের হাজত ব্যবস্থা হইল।

উপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার একান্ত অনুরক্ত সারদাচরণ যাহাতে কোন-

রূপ গোলযোগে না পড়ে সেই জন্য প্রথম হইতেই সকল দায়িত্ব আপন স্কন্ধে আরোপ করিয়াছিলেন, কিন্তু হাসপাতালে যখন শুনিলেন যে, সারদাচরণের হাজত হইয়াছে, জামিনে খালাস পায় নাই, তখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেন, তিনি সকলকেই, সারদাচরণ যাহাতে নিষ্কৃতি পায়, তাহার জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেন।

## ভীষণ সংবাদ।

ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিলেন। সকলেই এই সুস্থ সংবাদে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্যে পরিণত হইল। তিনি বলিয়াছিলেন—ফিরিঙ্গি আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই। বাস্তবিক তাহাই হইল। তিনি ইংরেজের কারাগার ত দূরের কথা—আপন-দেহ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া চিরমঙ্গলময় স্বাধীন রাজ্যে চলিয়া গেলেন। ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার তিনি হাসপাতালে গিয়াছিলেন, ১০ই কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৮টার সময় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এই ভীষণ সংবাদ লইয়া আসিল। পূর্ব্বদিন রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র অসুস্থের লক্ষণ দেখেন নাই। এ মৃত্যুর রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিল না। কেহ বলিল, ধনুষ্টঙ্কারে; কেহ বলিল, জলাতঙ্করোগে; আর কত জনে কত কথা বলিয়া আন্দোলন করিতে লাগিল।

পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে উপাধ্যায় তাঁহার কোন এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন —"আমি ফিরিঙ্গির জেলে যাইয়া কয়েদীর মত খাটিব না। আমি কখনও কাহারও ফরমাইস খাটি নাই—কাহারও হুকুমের তাঁবে থাকি নাই। চিরজীবনটা একভাবে কাটাইয়া শেষে প্রৌঢ়ের সীমায় আইনের

দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে—আর আমি বেগার খাটিব? আমি ফিরিঙ্গীর জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।' বন্ধু শুনিয়া একটু হাসিলেন। কিন্তু চিরকুমার সন্ন্যাসীর বাণী সত্যে পরিণত হইল। তিনি ইহধামের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। তাই সন্ধ্যার লেখক লিখিয়াছিলেন,—"ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ,—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু,—ইহাই কর্ম্মবীরের অবসান।"

চারিদিক হইতে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান, যুবক বৃদ্ধ, দলে দলে তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য হাসপাতালের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। তাঁহার সম্মানের জন্য অনেক দোকান পাট বন্ধ হইল। হাসপাতালের কর্ত্তারা শবদেহ সেখানে বহুক্ষণ রাখিতে দিলেন না। অগত্যা একটার সময় তাড়াতাড়ি তাঁহার শবদেহ বহন করিয়া বাহিরে আনা হইল। পথের ধারে গাছের তলায় শব রাখিয়া, সেই তীব্র রৌদ্রে অন্য সকল বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। বেলা ১টার সময় তাঁহার আত্মীয়বন্ধুবর্গ তাঁহার সাধের সন্ধ্যা আফিসে মৃতদেহ লইয়া আসিতে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে ঠন্‌ঠনিয়ার কালী বাড়ীর সম্মুখে সে দেহ রক্ষা করিয়া মায়ের নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত গ্রহণ করা হইল। আর একবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া ব্রাহ্ম নরনারীদের শোকাশ্রুর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া সকলে সন্ধ্যা আফিসে আসিলেন। তখনই কয়েকজন লোকনায়ক একখানি বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—বেলা চারিটার সময় সন্ধ্যা আফিস হইতে

## শোভাযাত্রা।

একটি শোভাযাত্রা করিয়া মৃত দেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে চারি পাঁচ সহস্র লোক আসিয়া সমবেত হইল। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য এত লোক উপস্থিত হইল

যে, ইতঃপূর্ব্বে আর কাহারও মৃতদেহের অনুগমনে এত অধিক লোক সমাগত হয় নাই। এখান হইতে কয়েকখানি ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিবার পর মৃত দেহ নানাপ্রকার পুষ্পপত্র প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ঠিক চারিটার সময় সকলে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শোভাযাত্রা শিবনারায়ণ দাসের লেন সন্ধ্যা আফিস হইতে বাহির হইয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট এবং নিমতলা ষ্ট্রীট দিয়া গমন করিয়া শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইল। যিনি এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি সাধারণের কতদূর ভক্তি ও ভাল-বাসা ছিল। সর্ব্বাগ্রে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গান করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন; তৎপশ্চাতে কতকগুলি স্বদেশপ্রাণ-যুবক উপাধ্যায়-মহাশয়ের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় শোভাযাত্রা শ্মশানঘাটে উপনীত হইল। মুহুর্মুহুঃ বন্দে মাতরম্ ও হরিবোল ধ্বনিতে শ্মশানভূমি বিকম্পিত হইতে লাগিল।

সভাস্থলে কতকগুলি সুমধুর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইল। শ্রদ্ধাভাজন স্বদেশ-হিতৈষী ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পত্নী, উপাধ্যায়-মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুন্দরীবাবুর পত্নী যখন উপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, তখন শ্মশানক্ষেত্রে যে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি যখন ভাবে বিভোর হইয়া উপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তখন শ্মশানে এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বাসিত হয় নাই। তিনি বলিলেন,—

"উপাধ্যায় মহাশয় আমাকে স্বদেশভক্তি শিখাইয়াছেন। আমার ন্যায় অনেক বঙ্গমহিলাকে উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। প্রাণপণে স্বদেশব্রতপালন ও

অশিক্ষিতা-মহিলা-সমাজে স্বদেশধর্ম্মের প্রচার করিলে উপাধ্যায় মহাশয়ের ঋণ কিয়ৎপরিমাণে পরিশোধ হইতে পারে। উপাধ্যায় মহাশয় যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্‌যাপিত হইয়াছে; তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে। তাই তিনি চলিয়া গেলেন। বিদেশী রাজশক্তি মনে করিয়াছিল,—তাঁহাকে বিভীষিকায় বশীভূত করিবে। কিন্তু তিনি ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন।"

কয়েকটী সুন্দর জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে পর, বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপাধ্যায়-মহাশয় সম্বন্ধে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে কয়েকটী কথা বলিলেন। পাঁচকড়িবাবুর পর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় জনমণ্ডলীর একান্ত অনুরোধে কিছু বলিলেন। শ্যামসুন্দরবাবু উপাধ্যায়-মহাশয়ের মৃত্যুতে এত অধিক আঘাত পাইয়াছিলেন যে, বেশী কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না। শ্যামসুন্দরবাবুর বলিবার পর, উপাধ্যায়-মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন। ভক্তগণ কলসে কলসে ঘৃত ও রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠ ও ধূপধূনা চিতানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনুকূল পবনে চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গগনস্পর্শী অনলশিখার মধ্যে যখন সে দেহ জ্বলিতে লাগিল, যখন চারিদিকে শোক-বিদ্ধ হৃদয়ের জাতীয় সঙ্গীতের রোল দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, তখন শ্মশান-বৈরাগ্যের তীব্র অনলে সকলের প্রাণ যেন জ্বলিয়া উঠিল। সকলে উদাসনয়নে সে অগ্নিসংযুক্ত তনুর পরিণাম দর্শন করিতে লাগিল। সেই চিতার উপর উপাধ্যায়ের হৃদয়শোণিতপুষ্ট কয়েকখানি 'সন্ধ্যা ও করালী' অর্পিত হইল। যে সুন্দর তনু, শ্যামনগর ও ভাটপাড়ার বাগানে ও জঙ্গলে, চুচুঁড়ার ভাগীরথীবক্ষে, গোয়ালিয়রের দুর্গে, রাজপুতনার মরুভূমি-প্রদেশে, হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যে, অক্সফোর্ডের দার্শনিক সভায়, কলিকাতার বিডন উদ্যানে, এলবার্ট হলে, এবং ভারতের নানাস্থানে নানা কার্য্যে এতদিন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিত,

আজ তাহা, শ্মশানে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইল! আজ পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিলাইল। আজ এক সোণার প্রতিমাকে, ভারতরত্নকে, চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে সসম্ভ্রমে চিতাভস্ম গ্রহণ করিয়া ভক্ত ও বন্ধুবর্গ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত দলে দলে যুবকবৃন্দ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ভক্তি ও ভালবাসা দেখাইবার জন্য শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। আজীবন মাতৃভূমির সেবায় রত থাকিয়া ষট্‌চত্বারিংশ বৎসর বয়সে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করিলেন।

যে শক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য এতদিন কত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহার অদ্য অবসান হইল; তিনি কর্ম্মী ও যোগী ছিলেন, ভগবান তাঁহার অন্তরের ব্যথা অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভীষ্মের ন্যায় ইচ্ছা-মৃত্যুর বর দিয়াছিলেন। তাই জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি স্বর্গা-রোহণ করিলেন।

তবে যাও, স্বদেশ-প্রাণ বীর—যেখানে আত্মবিচ্ছেদ নাই, দারিদ্র্যে নির্য্যাতন নাই, যেখানে অযথা উৎপীড়ন নাই, স্বাধীনতার বন্ধন নাই, সেই পুণ্যধামে গমন কর তোমার স্বাধীন পবিত্র আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। মাতৃভূমির কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ, এ কথা ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরকাল জাগিয়া থাকিবে। তোমার এ ঋণ কখন শোধ হইবে না। কিন্তু আজ হইতে ভারতবাসী তোমারই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মাতৃভূমির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তোমারই চরিত্রের উজ্জ্বল সুন্দর জ্যোতিঃ তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্র চিরপবিত্র ও আলোকিত করিবে।

হে ত্যাগি কর্ম্মিশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি দেহত্যাগের একমাস পূর্ব্বে কালী-ঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলে—মা আমার এ দেহভার

বহন করিতে আর সাধ নাই—বড়ই কলঙ্কিত অপবিত্র দেহ—আমায় আবার ব্রাহ্মণ-দেহ দিও, সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগৃহে আমাকে পাঠাইয়া দিও—আমি নবকলেবর ধারণ করিয়া কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে আসিয়া তোমার কার্য্যে—তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে সহায়তা করিব। আমি ত মা চিরকালই তোমার দুরন্ত ছেলে—আমি ত কাহা-রও বন্ধনের মধ্যে কখনও যাই নাই—এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে—যে, দেশের কাজ করিতে করিতে, সত্যের প্রচার করিতে করিতে, জেলে যাইবার পূর্ব্বে যেন আমার এ দেহ পঞ্চভূতে মিশায়।

মা তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তুমি মায়ের বড় আদরের সন্তান, পাছে ম্লেচ্ছস্পর্শে তোমার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত হয়, তাই ত্বরায় মা তোমাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। কিন্তু দুঃখিনী ভারতের ভাগ্যে কি রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন।

তুমি আবার আসিবে বলিয়াছ; তোমার মর-বাণী অমর সত্যে পরিণত হউক। আমরা তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। তুমি আবার আসিও—আবার আসিয়া এই লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতবাসীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিও।

---

# পরিশিষ্ট।

## মৌনী সাধুর সাক্ষাৎ।

যখন পশ্চিমাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেই সময় এলাহাবাদের বেণী-ঘাটে এক মৌনী সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রথমেই আপনাকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দিয়া সাধুর সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধু তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন— খৃষ্টান তাতে কি? ধর্ম্ম সবই সমান। সাধুর সহিত বেশ আলাপ হইল। সাধু কিছুদিন খৃষ্ট ভাবে সাধন করিয়াছিলেন। সাধুর নিকট হইতে সেই সকল শিক্ষা করিলেন। সাধুর উপর বিশেষ ভক্তি হইল। সাধু তাঁহাকে সময়মত তিন বার সাক্ষাৎ দিবেন বলিয়াছিলেন। সাধু তিনবারই সাক্ষাৎ দিয়াছিলেন। সাধুর আদেশমত তিনি বিয়াল্লিশ দিন খৃষ্টভাবে সাধন করিয়াছিলেন।

## আতুর আশ্রয়।

১৩০৮ সালে তিনি ও আনন্দ বাবু নামে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার এক বন্ধু, দুইজনে মিলিত হইয়া কলিকাতায় একটি আতুর-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। সহরের রাস্তায় অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, আতুর দেখিলেই তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইতেন। তাহাদের ঔষধ-পথ্য, আহার-আচ্ছা-দনের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দুইজনে ভিক্ষা করিতেন। এক পয়সার মুড়ি খাইয়া সারাদিন কাটাইয়া দিয়াছেন, এমন অনেক দিনও গিয়াছে। ক্রমশঃ অনেকগুলি এইরূপ আতুর সংগ্রহ হইল। কিছুদিন পরে আনন্দবাবুর সহিত আশ্রমের নিয়মাদি সম্বন্ধে

কিছু মতভেদ উপস্থিত হইল। সেই হইতে আনন্দ বাবু সেই সকল আতুরের ভার লইয়া তাঁহার নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। এই আশ্রমটি এখনও বিদ্যমান আছে।

## তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা।

১৩১২ সালের ফাল্গুন মাসে, তিনি শ্রীরামপুরে একটি তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই তাঁতশালার কার্য্যারম্ভ-দিবসে কলিকাতার "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়", বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গায়িতে সেখানে নিমন্ত্রিত হন। তাঁতশালার কার্য্য পরিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, সম্প্রদায়ের কতিপয় বিশিষ্ট সভ্য তাঁতশালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটি রৌপ্যপদক উপহার দেন।

## 'মদনমহলে' সাধনা।

চিত্রকুট পর্ব্বতের অনতিদুরে জব্বলপুরের অন্তর্গত, বিন্ধ্য পর্ব্বতের সানুদেশে গড়মণ্ডল নামে এক নগর আছে। পুরাকালে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রকৃতি ইহাকে আপনার প্রিয় ভূষণে সজ্জিত করিয়াছেন। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইয়া যায়। এই নগরের মধ্যে গঙ্গাসাগর ও প্রেমসাগর নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; রাত্রিদিন নানাজাতীয় বিহঙ্গ-কূজনে স্থানটি অতীব মনোরম। এখানে আসিলেই এক অভূতপুর্ব্ব পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়; মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা করিয়া তুলে।

বাদ্‌শা আকবর যখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে উত্তর ভারতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তখন এই ক্ষুদ্র নগরের প্রজাগণ রাণী দুর্গাবতীর শাসনে সুখে কালাতিপাত করিতেছিল। এই বীররমণীর নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আকবরের সেনাপতি আসফ্‌খাঁর সহিত সমরে এই রমণীরত্ন নিজেই অসিহস্তে সেনাদল পরিচালনা করিয়াছিলেন। এবং সেই যুদ্ধেই

তিনি দেহত্যাগ করেন। যুদ্ধ জয় করিয়াও, বাদ্‌শা এই রাজ্য আপন বশে আনিতে সমর্থ হন নাই। রোষে, ক্ষোভে বাদ্‌শার সেনাপতি চৌষট্টি-যোগিনী পরিবেষ্টিত গৌরীশঙ্করের মন্দির ভগ্ন করিয়া চলিয়া যান ও যোগিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার করিয়া ফেলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্করের মূর্ত্তির কিছুই নষ্ট করিতে পারেন নাই। ম্লেচ্ছ সেনাপতি নিজেই দেবাদিদেব মহাদেবের চরণে বর্শার আঘাত করেন। কিন্তু হায়! পশুপতির নিকট পশুবল প্রয়োগ করা বৃথা! ম্লেচ্ছ সেনাপতি, চক্ষে আর কিছু দেখিতে না পাইয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তখনই সেনাদল লইয়া ফিরিয়া চলিলেন। হিন্দু তখনও ম্লেচ্ছ-সহবাসে কদাচারী ও অনাচারী হইয়া পড়ে নাই, তাই দেবতা তখন জাগ্রত ছিলেন। তখনও দেশ ম্লেচ্ছের পদানত হইয়া পড়ে নাই, তাই তখনও ভারতে বীরত্বের সমাদর ছিল, সকলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অকাতরে প্রাণ দিত। তখনও ভারতের নানাস্থানে ম্লেচ্ছের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আয়োজন চলিতেছিল। কিন্তু বিধাতা ভারতের অদৃষ্ট অন্যরূপ স্থির করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর অধুনা 'গাঢ়া' বলিয়া পরিচিত। রাজ্যের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে নগরের নামের আয়তনও সঙ্ক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে গন্ধর্ব্বকিন্নর সেবিত সুরাসুরদিগের বিলাসভূমি বিন্ধ্যগিরির উপরে রাণীদুর্গাবতীর 'মদনমহল' নামে কেলিগৃহ। এই প্রাসাদ একখানি প্রস্তরের উপর নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণকৌশল অতি আশ্চর্য্যজনক। ইহার কারুকার্য্য দর্শন করিলে প্রাচীন শিল্পচাতুর্য্যের গৌরব মনে উদয় হয় ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কারুকার্য্য ও শিল্পচাতুর্য্যমণ্ডিত ইহার দরজাগুলি লইয়া গিয়া, ইংরেজরাজ আপনাদের ইংলণ্ডে মিউজিয়ম (যাদুঘর) শোভিত করিয়াছেন।

পুরাণে কথিত আছে, এই কামরূপী পর্ব্বত এক দিন আপন গর্ব্বে

সূর্য্যপথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষ গুরুদেব অগস্ত্যের আজ্ঞায় পথ মুক্ত করিয়া দেন। বিন্ধ্যগিরি তপস্যার দ্বারা ব্যোমকেশ মহাদেবের চৈতন্যসত্ত্বা আপনার প্রতি অঙ্গে সঞ্চারিত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই মধ্যপ্রদেশে প্রবাদ চলিত আছে—যেত্‌না কঙ্কর, ওত্‌না শঙ্কর।

এ সেই বিন্ধ্যগিরি, যাঁহার পদমূলে বসিয়া প্রবাসী যক্ষ জলধরকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপন বিরহগাথা বিরহিণীর নিকট পাঠাইয়াছিল। এ সেই বিন্ধ্যগিরি, যাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া অযোধ্যাধিপতি দশরথ-তনয় রামচন্দ্র, জনক-দুহিতা ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণের সহিত আশ্রয় লইয়াছিলেন। যিনি সুন্দ-উপসুন্দের ভীষণ হুহুঙ্কার শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি রামচন্দ্রের সহিত ভার্গবের বলপরীক্ষা দর্শন করিয়াছেন, দেবতা-বিজয়ী রাক্ষস রাবণের, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট পরাভব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যিনি জগতের কত উত্থান পতন, ভারতের কত সুখের দিন নয়নগোচর করিয়াছেন, তিনি আজ সেইভাবে দণ্ডায়মান! কিন্তু যেন কত ম্লান—কত বিষাদক্লিষ্ট! কেন এমন—কে ইহার উত্তর দিবে? কে তাঁহার বিষাদ দূর করিতে জীবন সঙ্কল্প করিবে? কে তাঁহার উপত্যকাভূমি ওষধিলতায় আবার পূর্ণ করিবে?

বিন্ধ্যশিখর-স্থিত এই পরিত্যক্ত ভগ্ন প্রাসাদে যোগী উপাধ্যায় ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। কি কামনায়, কোন্ সাধনে সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি এই নির্জ্জন প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা কেহই জানে না। এইখানে বসিয়া তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলচিন্তা করিতেন। এইখানে বসিয়া তিনি ভারতের পূর্ব্বগৌরব সকল চিন্তা করিতেন, এবং সেই সকল স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন। হৃদয়ে শত বৃশ্চিকদংশন যাতনা অনুভব করিতেন। কি করিয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরব সকল আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহার উপায় অন্বেষণে যত্নবান হইলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান তাঁহার কামনা কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিলেন। তিনি উপায় বুঝিতে পারিলেন;—তিনি বুঝিলেন যে,

এখন নির্জ্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়, সংসারের রণরঙ্গে মাতিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলাম যে, নর্ম্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া, সেই নিভৃত স্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা শুনিলাম! কত চেষ্টা করিলাম কথাটি ভুলিয়া যাইতে—কিন্তু যত ভুলিতে যাই, তত ঐ কথাটি প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। নির্জ্জন হইতে সজনে আসিলাম—আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু-চারিজন ভবঘুরে ঐ দৈববাণী শুনিয়াছে।

সূর্য্যদেব উদয় হইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি কিছু ছাতু বা কিছু চিড়া জলে ভিজাইয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতেন। সমস্ত দিন সেখানে সাধন ভজন করিয়া, গভীর রাত্রে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেন। কোন কোন দিন সেইখানেই নিশি-যাপন করিতেন। গভীর রাত্রে যখন পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেন, উপরে নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া, ভারতের দুঃখ স্মরণে অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত।

## প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা।

ভট্টপল্লী-বাসী পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি আপন জ্ঞান-কৃত-পাপ সকলের বিশদরূপে উল্লেখ করিয়া, তাহার দূরীকরণ মানসে একটি প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থার জন্য একদিন পত্র প্রেরণ করেন। তর্করত্ন মহাশয় তদুত্তরে এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাখানি প্রেরণ করিলেন। তিনি এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আপন প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

## অস্যোত্তরম্।

জ্ঞানকৃত-স্বধর্ম্মত্যাগধর্ম্মান্তরগ্রহণ ম্লেচ্ছদেশগমননিয়তবারা-ভোজ্যান্ন ভোজনাদিজনিত পাপক্ষয়ার্থিনা লিপিবিজ্ঞাপিত স্বরূপবান ব্রাহ্মণেন

বৈধভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা পুনরুপনয়নং—তদশক্তৌ তদনুকল্প চান্দ্রায়ণং—তদশক্তৌ ধেন্বষ্টকদানং—তদশক্তৌ তন্মূল্যা সার্দ্ধ-দ্বাবিংশতি কার্ষাপণীলভ্যরজতাদিদানং বা সদক্ষিণকং কর্ত্তব্যং। এতৎ প্রায়শ্চিত্তাৎ প্রাগপি তস্য সন্ধ্যাবন্দনাদৌ নিত্যকর্ম্মস্বধিকারোঽস্তি কৃত-প্রায়শ্চিত্তাযুত সুতরামেবেতি বিদুষাং পরামর্শঃ।

( স্বাক্ষর ) ভট্টপল্লীবাসি তর্করত্নোপাধিক

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণাম্।

শ্রীরাম।

শুভাশীর্ব্বিজ্ঞাপনম।

ব্যবস্থা-শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও বিনামূল্যে এরূপ ব্যবস্থা দিতে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিবে না; পূর্ব্বে কেহ কেহ স্বীকার করিলেও কার্য্যকালে পশ্চাৎপদ হইতেছে। তা হউক, আমি শাস্ত্রতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াই আপনাকে এই ব্যবস্থা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রদান করিতেছি; আপনি ভক্তিসহকারে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া শিখাসহ মস্তকাদি মুণ্ডন করিবেন, পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পর গায়ত্রীজপ ও প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিয়া গঙ্গা যে পতিতপাবনী ইহা মনে মনে বিশ্বাস করতঃ ভক্তিভরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিবেন। অনন্তর পুনরুপনয়ন বা চান্দ্রায়ণ, অভাবে ২২॥০ কাহন কড়ি বা ৫৲ টাকা ॥৵০ মূল্যের খাঁটিরূপা উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধার্থ পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবেন, পরে গোগ্রাস প্রদান করিবেন। একটী সদ্‌ব্রাহ্মণ পুরোহিত আবশ্যক। ইতি

( স্বাক্ষর ) আশী—

শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ।

এইরূপ করিলে আপনি বিশুদ্ধ হইবেন। যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না করেন, ততদিন ত্রিসন্ধ্যা করিবেন, প্রায়শ্চিত্তান্তে ত করিবেনই। ঐরূপ অকার্য্য আর কখন করিব না, ইহা স্থির রাখিবেন। ইতি

## ধর্ম্মবিপর্য্যয়।

তিনি একসময়ে হিন্দুধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়া ভারতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেণ্ট টমাস যেরূপ প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও তাঁহার শিষ্য আরিষ্টটল-প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্রের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংযোগ বিধান করিয়া, য়ুরোপে অতি সহজেই খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তিনিও সেইরূপ ভারতে শঙ্করপ্রবর্ত্তিত বেদান্তদর্শনের মধ্য দিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি অতীব বুদ্ধিমান, তিনি বুঝিয়াছিলেন—অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হিন্দুর নিকট প্লেটো বা আরিষ্টটলের দর্শনশাস্ত্র খাটিবে না; তাই শঙ্করপ্রবর্ত্তিত বেদান্তের সাহায্যে, নিষ্কাম নিবৃত্তিমুখীন ধর্ম্ম-পালনের মধ্য দিয়া খৃষ্টকে প্রকাশ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

তিনি একজন বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও ত্যাগী বীর ছিলেন সত্য, কিন্তু আবহমান কালব্যাপী ঋষিমুনিগণ-প্রবর্ত্তিত পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের উপর হস্ত-ক্ষেপ তাঁহার মত বিজ্ঞজনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি হিন্দুর কৃষ্ণকে খৃষ্টের নিম্নে স্থান দিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট যে প্রেমধর্ম্মের অবতার, ইহা হিন্দু স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে যাঁহার গীতোক্ত নিবৃত্তিমার্গ হিন্দুজাতিকে জ্ঞানে ও সভ্যতায় জগতের মধ্যে শীর্ষদেশে আসীন করিয়াছে, যাঁহার নিষ্কাম ধর্ম্মপালনে হিন্দুজাতি আজ অমরত্ব লাভ করিয়াছে, যাঁহাকে আর্য্যবংশধরগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া ভক্তি ও প্রেমে মাধুর্য্য-বিগ্রহরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহার স্থান অন্যের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাঁহার আসন অন্যে আসিয়া অধিকার করিলে, হিন্দুর পক্ষে মঙ্গলদায়ক বা সুখকর নহে। তিনি কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার, সাধুদিগের পরিত্রাতা ও দুষ্কৃতিদিগের দণ্ডদাতা এই

মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার উপর আর কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের অঙ্গহানি দোষে দুষ্ট হইতে হইত। ক্যাথলিক ধর্ম্মের তিনটি প্রধান বিধান আছে; সেইগুলি ক্যাথলিক মাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। প্রথম—পোপ ক্যাথলিক ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দ্বিতীয়—যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তৃতীয়—ব্যপ্তিস্মাব্যতীত ক্যাথলিক, ক্যাথলিকই নয়। সুতরাং, এখানে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি যখন একজন বিশ্বস্ত ক্যাথলিক ছিলেন তখন তাঁহাকে যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া অনুধাবন করিতে হইত এবং তাহা হইলেই খৃষ্টকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিতে তিনি অবশ্য বাধ্য।

কিন্তু যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া, সমস্ত ভারতকে মধুরে ও মঙ্গলে, নিষ্কাম নিবৃত্তিমুখীন করিয়া পবিত্র ও সঞ্জীবিত করিয়াছে, তাঁহার স্থান খৃষ্টের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, খৃষ্ট ও খৃষ্টের ধর্ম্মকে সে স্থানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচলনের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

মানুষ মাত্রেই ভ্রম বিদ্যমান। তিনি অদ্বৈতবাদী দার্শনিক ছিলেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ ও খৃষ্ট দুইই তুল্যভাবে আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া খৃষ্টেরই প্রাধান্য দেখাইতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এখানেই এক সময়ে তাঁহাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইতে হইয়াছিল।

ফারকোহার সাহেব কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া যখন নানা অযৌক্তিক ও সাম্প্রদায়িক দুষ্ট সমস্যার অবতারণা দ্বারা আপনাদিগের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তিনিই একমাত্র সেই পথের অন্তরায় হইয়া হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণযুক্তি দ্বারা সাহেবের সমস্যা খণ্ডবিখণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

তিনি ফারকোহারের সমস্ত ভ্রম উদ্ঘাটন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি হিন্দুর অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল কথা খুলিয়া বলিতে সমর্থ হন নাই।

তিনি কৃষ্ণ ও খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পরস্পর বিবাদ বিভিন্নতা মিটাইয়া মাঝামাঝি একটি নূতনপন্থা গঠন করিয়া সমাজে প্রবর্ত্তিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার এই নবপ্রবর্ত্তনা কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি খৃষ্টান সমাজে একটি যুগান্তর আনয়ন করিতেন সত্য. কিন্তু হিন্দুসমাজের যে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিভিন্নতা বা বিচিত্রতা না থাকিলেও ধর্ম্মের কখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না। ধর্ম্মবৈচিত্র্য একটি স্বভাব-সিদ্ধ নিয়ম। একজনের সহিত যেমন অন্যের সৌসাদৃশ্য নাই, একজনের অন্তরের সহিত যখন অন্যের অন্তরের পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন জগৎপ্রচলিত ধর্ম্মপন্থা সকলের মধ্যে যদি বিভিন্নতা বা বিচিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম কখনই সকল মানুষের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। অন্তর বৈচিত্র্য বাহ্য-বৈচিত্র্যেরই অনুরূপ। সকল মানুষ যেমন মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারে না, সেইরূপ সকল ধর্ম্মও মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারে না। নদী সকল যেমন নানা স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষ সেই একই মহাসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেইরূপ ধর্ম্মপন্থা সকল দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাবধারণ করিয়া শেষ সেই একই মহাসত্যে বিলীন হইয়াছে। যদিও সকল ধর্ম্মের মূলে সেই একই সদ্বস্তু বিদ্যমান, সেই এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই—একমেবাদ্বিতীয়ম্, কিন্তু যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছিতে পারিতেছে ততক্ষণ বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা স্বভাবসিদ্ধ। যে সেখানের, সে সেইখানেরই শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ না মহাসাগরে আসিয়া মিশিতেছে ততক্ষণ জর্ডন পালেস্তাইনের, ভাগীরথী ভারতের। জর্ডন কখন

ভাগীরথী হইতে পারিবে না, ভাগীরথীও কখন জর্ডন হইতে পারিবে না; কিন্তু যেখানে আসিয়া মহাসাগরে মিশিয়াছে সেখানে জর্ডনও নাই—ভাগীরথীও নাই। সেই এক অসীম অনন্ত জলকলস্রোত। সেইরূপ যতক্ষণ না সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে মিলিয়া—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই জ্ঞান না আসিবে, ততক্ষণ হিন্দু কৃষ্ণের—খৃষ্টান্ খৃষ্টের।

পরে তিনি আপনার এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এক স্থানে বলিয়াছিলেন—"একদিন ধর্ম্মের পথে ফিরিঙ্গিয়ানা এদেশে আনিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সে সমস্ত উদ্যম চেষ্টা বার্থ হইয়াছে। আমাদের এই ত্রিকালস্থায়ী ন্যগ্রোধতুল্য সনাতন সমাজের জটাতেও ফিরিঙ্গির পরগাছা গজায় না। তাই এখন বুঝিয়াছি—আমাদের পিতৃপরিচয় বজায় রাখিতে পারিলে আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক হইবে। তাই নিজ নিকেতনের দিকে আবার ফিরিয়া যাইতেছি।"

## কর্ম্মজীবনে বেদান্ত।

মেয়েদের ইথুপূজা হইতে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অদ্বৈতানুভূতি পর্য্যন্ত যত প্রকারের উপাসনা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, সকলের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব নিষ্ঠা বর্ত্তমান। সকল প্রকারের উপাসনা যে, অধিকারীবিশেষে অবশ্যকর্ত্তব্য এবং এ সকল বিষয়ে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতির আবশ্যকতা ও সমন্বয় যেমন শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ অনুসারে সিদ্ধ হয়, এমনটি অন্য কোন আচার্য্যের মতানুসারে সমন্বিত হওয়া সুকঠিন। এজন্য উপাধ্যায় মহাশয় শঙ্করমতের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি শঙ্করমতকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন—শঙ্করাচার্য্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন এরূপ আমার মনে হয় না। তবে অজ্ঞানীরা জগৎকে যেরূপ ভাবে দেখে, সেইরূপ ভাবে দেখাটা মিথ্যা বটে। তুমি তোমার ধারণা-অনুসারে তাহার এক অবস্থার বিকাশকে জগৎ বলিতেছ, কিন্তু

যখন তোমার চোখ ফুটিবে, ঠিক ঠিক দেখিতে পাইবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, একমাত্র সচ্চিদানন্দই বিদ্যমান। এই জগৎও সেই সচ্চিদানন্দের স্বরূপই।

যেমন একটী স্বর্ণঅঙ্গুরী দেখিয়া সকলেই বলে যে. ইহা একটী অঙ্গুরী, ইহা অঙ্গুলিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর—যে তুমি স্বর্ণটি বাদ দিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুরীটি লইয়া যাও, সে বলিবে ইহা অসম্ভব। কারণ স্বর্ণবাদ দিলে অঙ্গুরী কিছুই নয়। অঙ্গুরীর স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। আবার ঐ অঙ্গুরীটি ভাঙ্গিয়া যদি কুণ্ডল বা বলয় প্রস্তুত কর, তাহা হইলেও দেখিবে যে, স্বর্ণ বাদ দিলে কুণ্ডল বা বলয়রূপে তাহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অতএব এ স্থলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিবেন যে, স্বর্ণও যা, অঙ্গুরী, কুণ্ডল বা বলয়ও তাহাই। উহাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। অতএব আমার অঙ্গুরী আনিবার প্রয়োজন হইলে যদি কাহাকে স্বর্ণ আনিতে বলি, যে হয়ত অঙ্গুরী না আনিয়া কুণ্ডল আনিতে পারে বা একখণ্ড স্বর্ণও আনিতে পারে। কাজেই স্বর্ণের এক একটী রূপ কল্পনা করিয়া যদি অঙ্গুরী, কুণ্ডল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম না রাখি, তাহা হইলে সংসারে কাজকর্ম্ম চলা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে; কোন জিনিষ লইয়া তাহাকে ব্যবহারে আনা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্যই অঙ্গুরী প্রভৃতির গোলকাদি রূপ এবং অঙ্গুরী প্রভৃতির নাম, প্রকৃত পক্ষে কোন সত্যবস্তু না হইলেও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য উহাদিগকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। এই জন্যই আচার্য্য শঙ্কর দুইটি অবস্থাই স্বীকার করিয়াছেন। একটি ব্যবহারিক আর একটী পারমার্থিক। যখন লোক জাগিয়া থাকে, তখন আহার চাই, বস্ত্র চাই। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তখন সে আহার করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে কি না বা তাহার পরিধান-বস্ত্র আছে কি না, সে কিছুই জানিতে পারে

না। সেইরূপ যে ব্যক্তি এই জড়জগতের বিবিধ জড়বস্তু লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন নামের প্রয়োজন। কিন্তু যিনি সমাধি-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। জগৎ থাকিলেও তিনি জানেন না যে জগৎ আছে, না থাকিলেও তিনি বুঝেন না যে, জগৎ নাই। শঙ্কর এই ব্যবহারিক দশা এবং এই পারমার্থিক দশা—তুইটি অবস্থাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এই ব্যবহারিক দশাতে সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, ইথুপূজা প্রভৃতি সকল গুলিরই প্রয়োজন। কিন্তু পারমার্থিক দশায় অর্থাৎ সমাধি বা জীবনমুক্ত অবস্থায় সে ব্রহ্মব্যতীত আর দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায় না। কে কাহাকে পূজা করিবে? কে কাহার পূজা লইবে? সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। সর্ব্বত্রই একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বিরাজমান।

তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সার অংশ—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই জ্ঞান আপনার কর্ম্মজীবনের মধ্যে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু পূজা পার্ব্বণের মধ্যে, ধ্যানধারণার মধ্যে, অতি সামান্য সামান্য কার্য্যশৃঙ্খলার মধ্যেও সেই এক বেদান্ত ব্যবহার, সেই একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের স্তবস্তুতি অনুভব করিতেন। অতি সামান্য সামান্য বিষয়ের মধ্যেও এই গূঢ় ভাব অনুভব করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন।

তুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম, ইহার দ্বারা তাঁহার অন্তরের আভাস যথেষ্ট প্রকাশ পাইবে।

একদিন হাওড়া হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, গঙ্গার তটে কুলকামিনীগণ এক অশ্বত্থমূলে জলধারা সেচনে তরুবরকে পূজা করিতেছেন। এই দেখিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া বলিলেন—হিন্দুর কি তীব্র নিষ্ঠা, কি সূক্ষ্মদৃষ্টি। বৃক্ষের মধ্যেও হিন্দু ব্রহ্মের স্বরূপ পরিচয় পাইয়াছে। হিন্দুই বাস্তবিক অদ্বৈতের অন্তর্গত অনন্তের অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে। একের ভিতর এত ভিন্ন

ভিন্ন প্রকাশ—এত ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিন্দুর সূক্ষ্মদৃষ্টিতেই পড়িয়া থাকে। কেবলমাত্র হিন্দুর এই সূক্ষ্মদৃষ্টি অখণ্ডের মধ্যে এই অসীম খণ্ডবাহুল্য দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। কত না দেবদেবীর পূজা, কত না আয়োজন অনুষ্ঠান—হিন্দুর যেন ঐ জ্ঞান সব সময় সব-তাতেই ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুর সকল কাজের মধ্যেই সেই এক দৃষ্টি। হিন্দুর এই বিশ্বব্যাপক অনুষ্ঠান আকাঙ্ক্ষা ভরপুর করিয়াও যেন উপ্‌চিয়া পড়িতেছে। কোন কিছুতে অনটন নাই, সকল তাতেই হেলা ফেলা।

হিন্দু সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখিতেন বলিয়া কাহারও পূজা বাদ দেন নাই। যে কালসর্পের দংশনে কাহার অব্যাহতি নাই সেই সর্পকে দুধকলা দিয়া মনসারূপে পূজা করেন। গর্দ্দভ শীতলার বাহনরূপে, সারমেয়কে ভৈরবের, বৃষকে মহেশ্বরের, ময়ুরকে কার্ত্তিকেয়ের, মূষিককে গজাননের —এইরূপে পূজা না করেন, এমন জীব নাই। এমন কি, সিংহ ব্যাঘ্রকে মা-ভগবতীর বাহনরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়ঃভগবান বলিয়াছেন :—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংহংশসম্ভবম্॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত অথবা প্রভাববলাদি গুণদ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদায়ই আমার প্রভাবের অংশসম্ভূত জানিও

পতঞ্জলি একস্থানে বলিয়াছেন—যথাভিমত ধ্যানাদ্‌বা। শাস্ত্রে যে সকল বিশেষ বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় প্রভৃতি স্থানে ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, যদি তাহা করিতে কাহারও মন না চায়, তবে তাহার মনে যেটি ভাল লাগে সেইটিতে ধ্যান করিলেও সিদ্ধিলাভ হইবে। কারণ ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তিনি তাহার প্রিয়বস্তু ছাড়া নহেন। অথবা এই উপায়ে চিত্ত স্থির হইলেই সেই স্থির চিত্ত দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে।

তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, আমি কোন বৈশাখ মাসে গঙ্গাপার

হইতেছিলাম। বড়ই তুফান। নৌকা তরঙ্গের আঘাতে অস্থির হইতেছিল। আরোহীরা সকলেই ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। মাঝি মাঝে মাঝে ধম্‌কাইতেছে—চুপ ক'রে ব'সে থাকুন, ভয় নাই। যত সে ধম্‌কায় তুফানের তেজ ততই বাড়ে। নৌকা বুঝি যায়। আরোহীদিগের মধ্যে একটী প্রৌঢ়া নারী ছিলেন। দেখিলে বোধ হয় ব্রাহ্মণকন্যা। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মাগো—মায়ের রঙ্গ দেখ গো!

আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি বাজিয়া উঠিল। তুফানের কথা ভুলিয়া গেলাম। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সাধন ভজন করিয়া আমার যে কিছু সঞ্চয় হয় নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম। মাতৃরূপিণী বাঙ্গালি-রমণী বাঙ্গালির প্রাণের কথা আমাকে সেইদিন শিখাইল। ঐ যে তরঙ্গ নাচিতে নাচিতে আমাদের গ্রাস করিতে আসিতেছে—উহা কি আমার মায়ের রঙ্গ! যে প্রবল প্রভঞ্জন সংসারকে লণ্ড ভণ্ড করে—সে কি আমার মায়ের সুরভি নিশ্বাস! যে সর্ব্বগ্রাসী-অনল—কালী করালী স্ফুলিঙ্গিনী মনোজবা প্রভৃতি সপ্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দেয়—সে কি আমার মায়ের মনোমোহন রূপ! যে মৃত্যু ঘরে ঘরে রোদনের রোল তুলে—সে কি আমার করালরূপিণী মা!

তিনি বলিতেন, যেখানে বিনাশরূপী তালবেতালের নৃত্যে সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায়—বাঙ্গালি সেখানে মাতৃরূপিণী শিবানীর স্নেহ-সুষমা দেখে। আবার অপর দিকে কেন্দ্ররূপিণী একতাকে ভাঙ্গিয়া দেখিতেও অত্যন্ত পটু। অদ্বৈতের একতা শূন্য নহে। উহাতে অনন্ত ভেদ অনন্ত সুষমা বর্ত্তমান। দিন আসিতেছে—যখন বঙ্গীয় ন্যায়—বঙ্গীয় সূক্ষ্মদৃষ্টি অদ্বৈতের অন্তর্গত অনন্ত ঐশ্বর্য্য অধিকার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিবে।

সম্পূর্ণ।
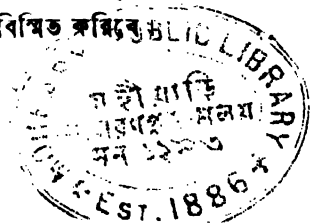
## শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত

| | | মূল্য |
|---|---|---|
| ১। | দ্বীপান্তরের কথা | ১৲ |
| ২। | মিলনের পথে | ১৷৹ |
| ৩। | মায়ের কথা | ৶৹ |

ও

## শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

| | | |
|---|---|---|
| ১। | নির্ব্বাসিতের আত্মকথা | ১৲ |
| ২। | সিনফিন | ।৵৹ |
| ৩। | বর্ত্তমান সমস্যা | ৶৹ |
| ৪। | অনন্তানন্দের পত্র | ৶৹ |
| ৫। | জাতের বিড়ম্বনা | ৶৹ |

এবং

শ্রীঅরবিন্দের যাবতীয় পুস্তক অতি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ রাখিয়া থাকি।

ম্যানেজার,

**বিজলী অফিস**

৯৩।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।